সুমন্ত আসলাম

# রোল নম্বর ১৩

অনতুর রোল নম্বর ১৩। ভীষণ দুষ্ট ও। কান ধরে দাঁড়িয়ে আছে– ও স্কুল মাঠের এক কোনায়। হেডস্যার ওকে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন এখানে। কিন্তু ওর বন্ধু দীপ্র, বিটলু, মৃদুল আর অয়ন জানে না কেন ওভাবে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে অনতুকে। যখন জানে তখন চোখ বড় বড় হয়ে যায় ওদের।

আবাসিক একটা স্কুলে পড়ে ওরা। লেখাপড়ায় বেশ ভালো, তবে মারাত্মক একটা দুষ্টমি করে ওরা প্রায়ই। রাতে স্কুল থেকে একসঙ্গে বের হয়ে অন্যের বাগান থেকে আম, লিচু, আনারস চুরি করে খায়। শুধু এ দুষ্টমিটাই, অন্য কোনো দুষ্টমি না। এ রকম এক রাতে ওরা দেখতে পায় ওদের স্কুলের রন, বাদল, টোটন আর ঝন্টুও স্কুলের বাইরে যাচ্ছে। কিন্তু ওরা কেন বাইরে যায় তা বুঝতে পারে না দীপ্ররা। চিন্তা করতে থাকে কেন ওরা এতরাতে বাইরে যায়?

নতুন একটা টিচার এসেছেন ওদের স্কুলে। আরেক রাতে ওরা দেখে নতুন স্যার তার রুম থেকে বের হয়ে একা একা স্কুলের মাঠ দিয়ে হাঁটছেন। কিন্তু তিনি কোনো দিকে তাকাচ্ছেন না, কোনো কিছু দেখছেনও না। অনতু স্যারের পিছু পিছু গিয়ে স্যারের গায়ের চাদরটা খুলে নিয়ে আসে, তবু কিছু বলেন না স্যার, তিনি কিছু টেরও পান না। কেন? স্যার কি তবে...

রাতে একদিন ভূত দেখে অজ্ঞান হয়ে যায় রতন। তাহলে কি রতনদের স্কুলে কোনো ভূত বাস করে?

ওদের স্কুলে ছোট একটা চোরও ধরা পড়ে এক রাতে। কিন্তু চোরটাকে চুপি চুপি ছেড়ে দেয় কেন অনতুরা?

এ সবকিছু জানার জন্য দীপ্ররা হন্য হয়ে ছোটে। একদিন তারা জেনেও যায় সবকিছু। গভীর রাতে স্যারের এভাবে হাঁটার কারণ জানতে পেরে অবাক হয়ে যায় ওরা। রতনরা অদ্ভুত এক কাজে বাইরে যায়, তা জেনে চোখে পানি এসে যায় ওদের।

সুমন্ত আসলাম

# রোল নম্বর ১৩

পার্ল
পাবলিকেশন্স

তৃতীয় মুদ্রণঃ একুশে বইমেলা ২০০৮
দ্বিতীয় মুদ্রণ : একুশে বইমেলা ২০০৮
প্রকাশকাল : একুশে বইমেলা ২০০৮

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
শফিউল ফারুক উজ্জ্বল

ISBN-984-70162-0026-7

পার্ল পাবলিকেশন্স, ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ থেকে হাসান জায়েদী কর্তৃক প্রকাশিত এবং সালমানী মুদ্রণ সংস্থা, নয়াবাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। অক্ষরবিন্যাস : ওয়ার্ল্ড কালার গ্রাফিক, ৪০/৪১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মূল্য : ১২০.০০ টাকা

---

Roll Number 13, by Sumanta Aslam, Published by Hassan Zaidi, Pearl Publications, 38/2 Banglabazar, Dhaka-1100. Date of Publication February 2008. Price : 120 Tk. Only
E-mail : pearl_publications@yahoo.com
Website : www.allaboutbangladesh.com

ছেলেটা আমাকে প্রায়ই ফোন করে। প্রয়োজনে, অথবা অপ্রয়োজনে। বেশ ভালো লাগে ওর ফোন পেলে। একদিন খুব গলা ভারী করে ফোন করল ও আমাকে। আমি বললাম, 'তোমার কি মন খারাপ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'আপনার জন্য।'

আমি জানি কেন এ ছেলেটা আমার জন্য মন খারাপ করেছে। আমার দুঃখে কেউ একজন দুঃখী হয়েছে, সহমর্মিতা প্রকাশ করেছে, এই তো মানুষ। মনটা ভালো হয়ে গেল আমার। প্রচণ্ড শব্দ করে হেসে উঠলাম আমি।

**রিশাদ, প্রিয় মাহবুব ময়ূখ রিশাদ,**

মনে আছে তোমার, তুমি একদিন আমার মন ভালো করে দিয়েছিলে? মানুষের মন ভালো করে দেওয়ার মন সবার থাকে না, স্রষ্টা তোমাকে সেই মন দিয়েছেন।

ভীষণ দুষ্টু ছিলাম ছোটবেলায়। সারাক্ষণ দুষ্টুমি করতাম। সারাক্ষণ দুষ্টুমি করলে কী হবে, লেখাপড়া করতাম কিন্তু ঠিকমতো।

মাঝে মাঝে মনে হয়, আবার যদি ছোট হতে পারতাম, আবার যদি দুষ্টুমি করতে পারতাম!

সেটা কি আর সম্ভব! তাই ছোট যেহেতু আর হতে পারব না, দুষ্টুমি যেহেতু আর করতে পারব না, তাহলে উপায় কী?

বেশ কিছুক্ষণ ভেবে উপায় একটা বের করে ফেলেছিলাম। আর সে উপায়টা হলো—সেই সব দুষ্টুমি নিয়ে বই লিখে ফেলা। কী, ভালো বুদ্ধি বের করেছি না!

জানো, আমার এক অঙ্ক স্যার একদিন কী বলেছিলেন? বলেছিলেন, 'একটুআধটু দুষ্টু হও, তাতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু লেখাপড়াটা ঠিকমতো করো।'

খুব সুন্দর একটা কথা বলেছিলেন অঙ্ক স্যার, তোমরা কী বলো?

**সুমন্ত আসলাম**
sumanto_aslam@yahoo.com

বিটলুর প্রচণ্ড ধাক্কায় ঘুম ভেঙে গেল আমার। রাগে ওকে যখন কিছু বলতে যাব, তার আগেই ও চোখ কচলাতে কচলাতে হাত দিয়ে ইশারা করে থামিয়ে দিল আমাকে। তারপর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, 'একটা সর্বনাশ হয়ে গেছে রে দীপ্র!'

ঝট করে বিছানা থেকে উঠে বসি আমি। রাতে মন্টুদের আনারস বাগান থেকে আনারস চুরি করে এনে, খেয়েদেয়ে শেষ করে, অনেক রাতে ঘুমাতে গিয়েছিলাম। চোখ থেকে ঘুম এখনো ছাড়েনি। ভালো করে তাকিয়ে দেখি ভালো করে সকালও হয়নি, অন্ধকার রয়ে গেছে এখনো। আমার রুমেরও কেউ ওঠেনি, ঘুমাচ্ছে সবাই। আমি বিটলুর হাত চেপে ধরে ওকে রুমের বাইরে এনে বললাম, 'কী হয়েছে?'

'আজ ভোরে আমাদের কোথায় যাওয়ার কথা ছিল?'

'কেন, শিলাদের আমগাছ থেকে আম চুরি করার কথা ছিল!'

'হ্যাঁ। অয়ন, মৃদুল আর তোকে ডেকে তোলার দায়িত্ব ছিল কার?'

'তোর।'

'সে জন্যই সবার আগে ঘুম থেকে উঠি আমি। তারপর রুম থেকে বের হয়ে আমাদের স্কুলের মাঠের দিকে তাকাতেই চমকে উঠি, দেখি— ।' বিটলু আর কিছু বলে না। আমার হাত টান দিয়ে একটা দেয়ালের আড়ালে চলে যায়। পাশের রুম থেকে বের হয়ে কে যেন বাথরুমের দিকে যাচ্ছে।

'তাকাতেই কী দেখলি?' ফিসফিস করে কথাটা বলে বিটলুর দিকে তাকাই আমি। বিটলু আমার কথার জবাব দেয় না, অন্যদিকে তাকিয়ে আছে ও। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাতেই চমকে উঠি আমি। স্কুলের দেয়াল টপকে কারা যেন ভেতরে ঢুকছে।

বিটলু আস্তে করে বলল, 'দেখতে পাচ্ছিস?'

'হ্যাঁ।'

'চিনতে পারছিস?'

'না তো!'

বিটলু আমার একটা হাত ধরে। পা টিপে টিপে এগোতে থাকে ও, আমিও

ওর পেছন পেছন এগোতে থাকি। আমাদের হোস্টেল বিল্ডিং পেরিয়ে অয়ন আর মৃদুলদের হোস্টেল বিল্ডিংয়ের দিকে এগিয়ে যেতেই থেমে যায় বিটলু। আমাকে সঙ্গে নিয়ে হোস্টেল বিল্ডিংয়ের কোনার মোটা পাকুড়গাছটার আড়ালে গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর হাতটা একটু চাপ দিয়ে ফিসফিস করে বলে, 'দেখতে পাচ্ছিস তো তুই?'

'হ্যাঁ।'

'এখন চিনতে পারছিস?'

'না।'

'এখনো চিনতে পারছিস না?'

'উঁহু।'

'ওটা কাদের হোস্টেল বিল্ডিং?'

'টোটন-ঝন্টুদের হোস্টেল বিল্ডিং।'

'ভালো করে তাকিয়ে দেখ।'

ভালো করে তাকালাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে আবার চমকে উঠলাম। টোটন, ঝন্টু, বাদল আর রতন পা টিপে টিপে ওদের রুমে ঢুকছে।

'সারা রাত ওরা বাইরে ছিল নাকি?' বিটলুকে জিজ্ঞেস করি আমি।

'আমার তো তা-ই মনে হচ্ছে।'

'কোথায় গিয়েছিল ওরা?'

'ব্যাপারটা জানা দরকার।' বিটলু আমার দিকে তাকিয়ে কিছুটা ভয় ভয় গলায় বলে, 'রাতে যে আমরা বাইরে গিয়ে মন্টুদের আনারস চুরি করে খেয়েছি, ওরা দেখে ফেলেনি তো!'

'কী জানি, দেখতেও পারে।'

'তাহলে তো সর্বনাশ!' বিটলু আমার হাতটা আরো জোরে চেপে ধরে কেমন যেন কেঁপে ওঠে।

'আমরাও তো ওদের দেখে ফেলেছি।'

'ওদের তো কিছু চুরি করতে দেখিনি।'

আমি বিটলুর মাথায় জোরে একটা টোকা দিয়ে বলি, 'তাতে কি! ওরা বেশি ফালাফালি করলে বলব, আমাদের সঙ্গে ওরাও মন্টুদের বাগান থেকে আনারস চুরি করেছে।'

'ব্যাপারটা অয়ন আর মৃদুলকে জানানো দরকার।'

'অবশ্যই।'

মৃদুল আর অয়ন একই হোস্টেলের একই রুমে থাকে। আমরা চুপি চুপি ওদের রুমে ঢুকে প্রথমে মৃদুলকে ডেকে তুলি। একটু পর অয়নকে ডেকে

তোলার জন্য যেই না ওর পিঠে ধাক্কা দিয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে ও লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসে বলে, 'আমি না, আমি না...।'

বিটলু দ্রুত অয়নের মুখ চেপে ধরে ফিসফিস করে বলে, 'এমন চিৎকার করে উঠলি কেন গাধা!'

মুখ থেকে বিটলুর হাত সরিয়ে অয়ন ভালো করে আমাদের দিকে একবার করে তাকায়। তারপর বিটলুর দিকে চেয়ে মুখটা বিকৃত করে বলে, 'আমি একটা স্বপ্ন দেখছিলাম।'

'স্বপ্ন?'

'ভীষণ খারাপ স্বপ্ন।'

হাত দিয়ে ইশারা করে অয়নকে বাইরে এনে বললাম, 'কী খারাপ স্বপ্ন দেখেছিস, বল?'

অয়ন কিছু বলার আগেই বিটলু বলল, 'নিশ্চয়ই মন্টুর বাবাকে স্বপ্ন দেখেছিস তুই, না?'

অয়ন মুখটা হাসি হাসি করে বলল, 'কী করে বুঝলি?'

বিটলুও হাসতে হাসতে বলে, 'আমিও মন্টুর বাবাকে স্বপ্ন দেখেছি, ড্যানজারাস স্বপ্ন।'

খপ করে বিটলুর একটা হাত চেপে ধরে অয়ন বলে, 'বল তো কী স্বপ্ন দেখেছিস!'

বিটলু একটু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলে, 'দেখি, রাতে যেভাবে আমরা আনারস চুরি করতে গিয়েছিলাম মন্টুদের বাগানে, স্বপ্নেও সেভাবে গিয়েছি। বড় বড় আনারস পাওয়ার জন্য যতই বাগানের ভেতর ঢুকছি, ততই বড় বড় আনারস পাচ্ছি। বাগানের ঠিক মাঝখানে ঢোকার পর হঠাৎ দেখি আমি আর হাঁটতে পারছি না।'

'কেন?' মৃদুল কিছুটা উত্তেজনা নিয়ে বলে।

'পেছন থেকে কে যেন টেনে ধরেছে আমাকে!'

'কে টেনে ধরেছে।' চোখ দুটো বড় বড় হয়ে যায় আমার।

আমার দিকে তাকিয়ে বিটলু বলে, 'কে টেনে ধরেছে, আমি তা বুঝতে পারিনি। সামনের দিকে পা বাড়াতেই দেখি, পা আর এগোচ্ছে না, শক্ত করে কার সঙ্গে যেন বাধা।'

'পেছনে তাকিয়ে দেখিসনি কার সঙ্গে বাধা?' মৃদুলও কেমন যেন হাপাতে হাঁপাতে বলে।

'ওরে বাপ রে, পেছনে তাকানোর সাহস ছিল তখন! আমি পেছনে না তাকিয়েই পা টানতে থাকি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। পা-ও ছাড়ানো যায়

না, সামনের দিকেও এগোনো যায় না। এমন সময় হঠাৎ শুনি, কে যেন আমার দিকে চিৎকার করে এগিয়ে আসছে। কাছে আসতেই দেখি মন্টুর বাবা। আমাকে দেখেই তিনি একটা লাঠি দিয়ে পেটাতে থাকেন আর আমি চিৎকার করতে থাকি গলা ছেড়ে।'

'ঘুমের ভেতর চিৎকার করলে তো আশপাশের অনেকেই শুনতে পায়, তোর আশপাশের কেউ শুনতে পায়নি?' আমি বলি।

'শুনতে আবার পায়নি। আমার চিৎকার শুনে আমার পাশের বেডের সুমনও চিৎকার করে ওঠে। শেষে দুজনই একসঙ্গে থেমে যাই। পরে আমি ওকে হেসে হেসে স্বপ্ন দেখার কথা বলি।' বিটলু হঠাৎ চোখ দুটো বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, 'ভালো কথা, টোটন-ঝন্টুদের কথা বলা দরকার না?'

'ওরা আবার কী করল?' অয়ন কিছুটা চমকে উঠে বলে।

'একটু আগে দেয়াল টপকে স্কুলের ভেতর আসতে দেখেছি ওদের।' আমি কিছুটা কাঁপা গলায় বলি।

'রাতে ওরা বাইরে ছিল নাকি?' মৃদুল জিজ্ঞেস করে।

'তা-ই তো মনে হলো। যেভাবে ওদের চুপি চুপি স্কুলের ভেতর ঢুকতে দেখলাম, তাতে তো ধরে নেওয়া যায় ওরা সারা রাতই স্কুলের বাইরে ছিল।'

'সারা রাত কোথায় ছিল ওরা?' অয়ন আমার দিকে তাকিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করে।

'তা তো জানি না! তবে আমার মনে হয় ভালো কোনো কাজে বাইরে ছিল না ওরা।'

মৃদুল হাসতে হাসতে বলে, 'আমরাও তো রাতে বাইরে গিয়েছিলাম, আমরাও কি ভালো কাজে গিয়েছিলাম?'

'আমাদের কথা আলাদা।'

'আমাদের কথা আলাদা হবে কেন?' মৃদুল আমার পেটে একটা খোঁচা দিয়ে বলে।

'আমরা তো সামান্য আনারস চুরি করতে গিয়েছিলাম।' আমিও মৃদুলের পেটে একটা খোঁচা মেরে বললাম।

'আনারস সামান্য হলো?'

'আনারস সামান্য না তো কী?'

অয়ন আমাদের থামিয়ে দিয়ে বলে, 'না, চুরি চুরিই, তা সেটা যত সামান্যই হোক।'

'তা ঠিক।' আমি অয়নের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বললাম।

'কিন্তু আমার যেটা মনে হচ্ছে, টোটন-ঝন্টুরা আমাদের মতো ছিঁচকে চুরি

করার জন্য রাতে স্কুলের বাইরে যায়নি।' বিটলু বলল।

'তুই কি ধারণা করতে পারিস, কেন ওরা বাইরে গিয়েছিল?' মৃদুল জিজ্ঞেস করে বিটলুকে।

'খুব খারাপ একটা কাজে যে ওরা বাইরে গিয়েছিল সেটা বুঝতে পারছি, কিন্তু কী কাজে গিয়েছিল আপাতত তা বলতে পারছি না। তবে অল্প দিনের মধ্যেই সেটা বের করে ফেলব আশা রাখি।' বিটলু হঠাৎ সামান্য চিৎকার করে উঠে বলে, 'ও আল্লা, আসল কথাই তো ভুলে গেছি আমি।'

বিটলুর চিৎকারে আমরা একসঙ্গে সবাই চমকে উঠি। মৃদুল বিটলুর একটা কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, 'কী ভুলে গেছিস?'

'শিলাদের গাছের আম চুরি করার জন্য সকালে তোদের ডাকার কথা ছিল না আমার?' বিটলু কিছুটা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল।

'হ্যাঁ।' মৃদুল বলল।

'সে জন্য ভোরে ঘুম থেকে উঠে বাইরে আসি আমি। তারপর স্কুলের মাঠের দিকে তাকাতেই চমকে উঠি।'

'কেন?'

বিটলু আর কিছু বলে না। আমাদের সবাইকে ইশারা করে ওর সঙ্গে আসতে বলে। কিছুটা উত্তেজনা নিয়ে আমরা ওর পেছন পেছন হাঁটতে থাকি। ওদের হোস্টেল বিল্ডিংটা আমাদের স্কুলের এক কোনায়। ও ওদিকে যাচ্ছে, আমরাও যাচ্ছি।

বিটলু ওর হোস্টেল-বিল্ডিংয়ের বারান্দায় পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটা থামিয়ে দেয়। সামনে হাত বাড়িয়ে ইশারা করে আমাদের তাকাতে বলে সামনের দিকে। অল্প অল্প অন্ধকার চারদিকে, ভালো করে সকাল হয়নি এখনো। আমরা বিটলুর ইশারা মতো সামনের দিকে তাকাই। প্রথমে আমরা তেমন কিছু বুঝতে পারি না। একটু ভালো করে তাকাতেই প্রচণ্ড অবাক হয়ে যাই আমরা, নিঃশ্বাস নিতে ভুলে যাই আমরা সঙ্গে সঙ্গে, চোখ দুটো বড় বড় হয়ে আসে আমাদের, ভীষণ বড়।

কান ধরে দাঁড়িয়ে আছে অনতু। ওর সামনে একটা ছোট্ট টেবিল, সেই টেবিলের ওপর কী যেন একটা জিনিস রাখা আছে। জিনিসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না, কারণ একটা কাগজের প্যাকেট দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে সেই জিনিসটা।

অনতু একেবারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। ও নড়ছে না, কিন্তু মাথাটা একবার এদিক নিচ্ছে, আবার ওদিক নিচ্ছে, কখনো নিচের দিকে তাকাচ্ছে, কখনো আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে কী যেন বলছে।

আমরা ভালো করে তাকাতেই দেখি, আমাদের স্কুলের নাইটগার্ড আঙ্কেল একটু ফাঁকে একটা টুলের ওপর বসে আছেন। সম্ভবত অনতুকে পাহারা দেওয়ার জন্য এখানে রাখা হয়েছে তাকে, কিন্তু তার হাতের মোটা লাঠিটার সঙ্গে মাথা ঠেকিয়ে ঘুমাচ্ছেন তিনি। অবশ্য আমাদের স্কুলের সবাই জানে, আমাদের নাইটগার্ড আঙ্কেল সারা রাত ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই পাহারা দেন সবকিছু। যে কারণে আমরা প্রায় রাতেই দেয়াল টপকিয়ে হোস্টেলের বাইরে যেতে পারি।

মৃদুল অবাক হয়ে বলল, 'ব্যাপার কী রে?'

'সেটাই তো বুঝতে পারছি না।' বিটলুও অবাক হয়ে বলল।

'এত সকালে ও কী করল যে এভাবে কান ধরে দাঁড়িয়ে আছে!' অয়ন বিটলুর দিকে তাকিয়ে বলল।

'তোদের বললাম না, সকালে তোদের ডেকে তোলার জন্য রুম থেকে বের হয়েই চমকে উঠি আমি। তখন তো বেশ অন্ধকার ছিল, প্রথমে তাই কিছু বুঝতে পারিনি। কিন্তু ভালো করে তাকাতেই দেখি, কে যেন দাঁড়িয়ে আছে স্কুলের কোনায়। বুকের ভেতর কেমন যেন করে ওঠে তখন, ভূত-টুত না তো! পরক্ষণেই ভাবলাম, এখানে ভূত আসবে কোথা থেকে। তাই একটু সাহস নিয়ে স্কুলের কোনার দিকে এগিয়ে যেতেই দেখি, অনতু দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। প্রথমে ভাবলাম ভুল দেখছি, তাই চোখ কচলিয়ে ভালো করে আবার তাকিয়ে দেখি, না, ভুল দেখিনি, অনতুই দাঁড়িয়ে আছে সেখানে।'

'তুই ওর সঙ্গে কথা বলিসনি তখন?' আমি বিটলুর কাঁধে হাত রেখে বলি।

'কথা বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আরো একটু এগিয়ে যেতেই দেখি টুল থেকে উঠে দাঁড়িয়েছেন নাইটগার্ড আঙ্কেল। অনতুর কাছে গিয়ে ওকে ভালো করে দেখে আবার টুলে এসে বসলেন।'

'তিনি তাহলে তখন জেগে ছিলেন?'

'হ্যাঁ, তাই কথা বলার সুযোগ হয়নি ওর সঙ্গে।' বিটলু একটু থেমে বলে, 'কিন্তু আমার মাথায়ই আসছে না অনতু কী এমন করল যে ওকে এমন করে মাঠের কোনায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে।'

'তাও এমনি এমনি না, কান ধরে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে।' মৃদুল বেশ কষ্ট নিয়ে কথাটা বলে।

'আচ্ছা, অনতুকে এভাবে দাঁড় করিয়ে রেখেছে কে?' আমি বিটলুর দিকে তাকিয়ে বলি।

'কে আবার, হেডস্যার। দেখছিস না, নাইটগার্ড আঙ্কেল পাহারা দিচ্ছেন ওকে, যাতে ও একটুর জন্যও কান থেকে হাত সরাতে না পারে।' বিটলু বলে।

'আমার সবচেয়ে ভয় লাগছে টোটন-ঝন্টু-বাদল আর রতন যখন অনতুকে এভাবে দেখবে, তখন ওরা না-জানি কেমন করে।' সবার দিকে তাকিয়ে অয়ন মন খারাপ করে বলে।

'প্রথমে তো হাসাহাসি করবে, তারপর অভিনয় করে দেখাবে। রতন আবার অন্যকে নকল করে যা ভালো অভিনয় করে দেখাতে পারে! ও স্কুলের সবাইকে অভিনয় করে দেখাবে।' বিটলু বলে।

'এতে অনতুর প্রেস্টিজ একেবারে পাংচার হয়ে যাবে।' অয়ন রাগী রাগী গলায় বলে।

'আর অনতুর প্রেস্টিজ পাংচার হওয়া মানে আমাদের প্রেস্টিজ পাংচার হওয়া।' বিটলু অয়নের চেয়ে রাগী রাগী গলায় বলে।

'আচ্ছা, অনতু তো আমাদের সঙ্গে মন্টুদের বাগানের আনারস চুরি করতে গিয়েছিল। আমরা সব আনারস বাইরে খেয়ে এসেছি, ও অবশ্য একটা আনারস নিয়ে এসেছিল।' মৃদুল বলল।

'সর্বনাশ! আমার মনে হয় ও তাহলে আনারসসহ হেডস্যারের হাতে ধরা পড়েছে। তোরা তো জানিস, হেডস্যার মাঝে মাঝে হঠাৎ হঠাৎ রাতে আমাদের চারটা হোস্টেলই ঘুরে দেখেন।' আমি বলি।

বিটলু অনতুর সামনের টেবিলটার দিকে তাকিয়ে বলে, 'হ্যাঁ, ওই কাগজের প্যাকেটের নিচেই আনারসটা থাকতে পারে।'

'আচ্ছা, একটা কাজ করব নাকি আমরা?' মৃদুল চোখ কিছুটা বড় বড় করে সবার দিকে তাকিয়ে বলে।

'কী?' আমি, বিটলু আর অয়ন প্রায় একসঙ্গে বলি।

'অনতুর সামনের টেবিল থেকে আনারসটা গায়েব করে দেব নাকি আমরা?' মৃদুল আবার সবার দিকে তাকায়।

'তাতে লাভ?' বিটলু বলে।

মৃদুল একটু ভেবে বলে, 'লাভ তো দেখছি না। হেডস্যার এসে যখন অনতুর সামনে আনারসটা পাবেন না, তখন ওকেই সন্দেহ করবেন তিনি। তাতে ওর ওপর শাস্তি আরো বেড়ে যাবে।'

'এখন তাহলে কী করা যায়?' মাথা চুলকাতে চুলকাতে আমি স্কুলের কোনার দিকে তাকাই।

'একবার চেষ্টা করে দেখব নাকি অনতুর সঙ্গে কথা বলতে পারি কি না?' বিটলু বলে।

'সেটা করতে পারলে তো ভালোই হতো, কিন্তু চেষ্টাটা করা বোধহয় ঠিক হবে না।' মৃদুলও স্কুলের কোনার দিকে তাকিয়ে কথাটা বলে।

'কেন?'

'হেডস্যার ব্যাপারটা জানতে পারলে আমাদেরও শাস্তি দেবেন।'

'হেডস্যার আমাদের শাস্তি দেবেন কেন?' বিটলু একটু শব্দ করে কপাল কুঁচকিয়ে বলে।

'অনতুর সঙ্গে চুপি চুপি কথা বলার বিষয় জানতে পারলে স্যার ভাববেন, অনতুর সঙ্গে রাতে হোস্টেলের বাইরে গিয়ে আমরাও তাহলে আনারস চুরি করেছি।' মৃদুল একটু ভয় ভয় গলায় বলে।

'অনতুর সঙ্গে আমাদের কথা বলার বিষয় জানতে পারলেই হেডস্যার ভাববেন আমরাও আনারস চোর! এটা তো অনতুকে শাস্তি দেওয়ার সময়ও জানতে পারবেন।' অয়ন বলে।

'কীভাবে?' মৃদুল অয়নকে জিজ্ঞেস করে।

অয়ন একটু ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, 'অনতু যখন শাস্তি পাবে তখন কি আমাদের কথা বলে দেবে না?'

'তোর তা-ই মনে হয়?' বিটলু অয়নের কাঁধে একটা ধাক্কা দিয়ে বলে, 'তুই এত দিন ধরে অনতুর সঙ্গে মিশে এ কথাটা বলতে পারলি? তুই ওকে চিনিস না? ও শাস্তি পেতে পেতে মরে যাবে, তাও কারো কথা বলবে না। তুই দেখে নিস।'

অয়ন কী একটা বলতে নেয়, কিন্তু থেমে যায়। হোস্টেল-অ্যালার্ম বেজে উঠেছে, সবাইকে এখন ঘুম থেকে উঠতে হবে এবং মাত্র পঁচিশ মিনিটের মধ্যে রেডি হয়ে স্কুলের মাঠে আসতে হবে।

আর একমুহূর্ত দেরি না করে আমরা যার যার হোস্টেল রুমের দিকে পা বাড়ালাম। একটু এগিয়ে এসেই আমরা আবার ফিরে তাকালাম অনতুর দিকে। অনতু আমাদের দেখে ফেলেছে, ও আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসছে, কান দুটো ধরেই হাসছে।

রেডি হয়ে এসে আমরা দেখি—চার হোস্টেলের প্রায় সবাই এসে গেছে স্কুল মাঠে। লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে সবাই এবং অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে অনতুর দিকে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, অনতুও তাকিয়ে আছে সবার দিকে। হাসি হাসি মুখ করে ও চোখ দুটো সামনে মেলে দিয়েই তাকিয়ে আছে এবং কান দুটোও ধরে আছে আগের মতোই।

বিটলু ফিসফিস করে আমাকে বলল, 'টোটন-ঝন্টুরা কোন লাইনে দাঁড়িয়ে আছে, দেখেছিস নাকি?'

'ওরা তো আমাদের সঙ্গে ক্লাস সেভেনের লাইনেই দাঁড়াবে।'

'কই, দেখছি না তো!'

'তাহলে বোধহয় এখনো আসেনি।'

'আল্লার কসম, ওরা যদি অনতুকে নিয়ে কোনোরকম হাসাহাসি করে তাহলে ওদের সবাইকে আমি মাটির নিচে পুঁতে ফেলব।' বিটলু রাগী রাগী গলায় বলল।

মৃদুল লাইনের পেছন থেকে একটু শব্দ করে বলল, 'এত রেগে যাচ্ছিস কেন, বিটলু? এত রেগে যাওয়ার তো...।' কথাটা শেষ করতে পারল না মৃদুল। আমি আর বিটলু সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছন দিকে তাকিয়ে দেখি, মৃদুল চোখ বড় বড় করে সামনের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখছে। আমরাও সামনের দিকে তাকাই এবং চমকে উঠি। টোটন, ঝন্টু, বাদল আর রতন একসঙ্গে অনতুর সামনে দাঁড়িয়ে আছে, মুচকি মুচকি হাসছে ওরা। হাসতে হাসতে রতন অনতুর দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে কী যেন বলল। অনতু কিছু বলল না, কেবল রতনের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ।

বিটলু হঠাৎ লাইন ছেড়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে নিতেই ওর হাত টেনে ধরে আমি বলি, 'কোথায় যাচ্ছিস তুই!'

'রতনের একটা দাঁত তুলে নিয়ে আসি।'

'পাগলামো করছিস কেন বিটলু, একটু পর স্যারেরা চলে আসবেন।'

'শালাদের সাহস দেখেছিস!'

'দেখেছি, ওদের সাহসের জবাব আমরা পরে দেব। আগে দেখি, অনতুর আজ কী শাস্তি হয়।'

অয়ন এতক্ষণ চুপ করে ছিল। লাইনে মৃদুলের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে ও। আমার, মৃদুলের আর বিটলুর পাশ কেটে ও হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর আমরা তিনজন কেবল শুনতে পাই এমন শব্দ করে বলল, 'আজ ক্লাস শেষে আমার প্রথম কাজ হবে ওই চার শালার পাছায় গুনে গুনে তিনটা করে লাথি দেওয়া।'

'আর আমার মনে হচ্ছে ওদের ন্যাংটো করে গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে সারা গায়ে চিনি মেখে লাল পিঁপড়া ছেড়ে দিই।' মৃদুল দাঁত কিড়মিড় করে চিবিয়ে চিবিয়ে বলে।

স্কুলের সব স্যার এসে গেছেন, হেডস্যার আসেননি। হেডস্যার এলেই আমাদের পাঁচ মিনিট এক্সারসাইজ, এক মিনিট এক হাত সামনে নিয়ে শপথ পাঠ, তারপর জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে যার যার ক্লাসে যেতে হবে।

আমাদের স্কুলটা হচ্ছে কিছুটা ক্যাডেট কলেজের মতো, আবাসিক স্কুল। দিন-রাত সব সময় আমাদের এখানেই থাকতে হয়। বছরে আমরা দুই ঈদ আর কয়েকটা ফেস্টিভ্যালে ছুটি পাই, তখন আমরা যার যার বাড়ি যেতে পারি। আমাদের স্কুলে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ছাড়াও বছরে এক দিন প্যারেন্টস ডে পালিত হয়। সেদিন সবারই বাবা-মা স্কুলে চলে আসেন। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, প্রত্যেকের বাবা-মা সেদিন বাসা থেকে যে পরিমাণ খাবার রান্না করে নিয়ে আসেন, আমাদের স্কুলের মানুষজন যদি সেদিন ডবল হয়ে যায়, তবু খাবার খেয়ে শেষ করা যাবে না। আরো একটা মজার ব্যাপার হলো, আমাদের স্কুলে কখনো কাউকে শরীরে আঘাত করে শাস্তি দেওয়া হয় না, কোনো অপরাধ করলে তাকে শাস্তি দেওয়া হয় অদ্ভুত কোনো উপায়ে। অবশ্য কিছু স্যার হঠাৎ হঠাৎ শরীরে অল্প-স্বল্প আঘাত করেন, তবে হেডস্যার কোনো দিনই কারো শরীরে আঘাত করেননি।

ক্লাস নাইনের মিঠু ভাইয়া প্রায়ই স্কুল মাঠে দেরি করে আসতেন। এক্সারসাইজ শেষ হওয়ার পর শপথও শেষ হয়ে যেত, তারপর তিনি আসতেন। প্রথম কয়েক দিন হেডস্যার কিছু বলতেন না। একদিন বললেন, 'মিঠু, প্রায় দিনই স্কুল মাঠে আসতে তোমার এত দেরি হয় কেন?'

মিঠু ভাইয়া মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলতেন, 'স্যার, ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে যায়। কাল থেকে আর হবে না স্যার।'

কিন্তু দু-এক দিন পর মিঠু ভাইয়া আবার দেরি করতে থাকেন। হেডস্যার আবার জিজ্ঞেস করেন, মিঠু ভাইয়া আগের মতোই বলেন, 'আর দেরি হবে না স্যার।'

মিঠু ভাইয়া পরের দিন থেকে আবার দেরি করতে থাকেন। কয়েক দিন

পর হেডস্যার একদিন মিঠু ভাইয়ার রুমে গিয়ে বলেন, 'মিঠু, তোমাকে সাত দিন ক্লাস করতে হবে না, ক্লাসের পড়াও তাই তোমাকে পড়তে হবে না। এমনকি রুমের বাইরেও যেতে হবে না তোমাকে। তুমি শুধু ডাইনিংয়ে গিয়ে খেয়ে আসবে আর ঘুমাবে। আর কোনো কিছুই তোমাকে করতে হবে না। আমাদের দপ্তরি মোখলেস তোমাকে খেয়াল রাখবে সব সময়।'

হেডস্যার কথাটা বলে রুম থেকে চলে যেতেই খুশিতে নাচতে থাকেন মিঠু ভাইয়া। কিন্তু দুদিন যেতে না যেতেই মিঠু ভাইয়া স্কুল-মাঠে এসে উপস্থিত। হেডস্যার মিঠু ভাইয়াকে দেখেই জিজ্ঞেস করেন, 'কী ব্যাপার মিঠু, তোমার তো স্কুল-মাঠে আসার কথা না। তোমার তো এখন ঘুমানোর কথা।'

মিঠু ভাইয়া কান্না কান্না চেহারা করে বলেন, 'স্যার, আমাকে মাফ করে দিন। আর ঘুমাতে ভালো লাগছে না।'

'কেন?' হেডস্যার জিজ্ঞেস করেন।

'শুয়ে থাকতে থাকতে পিঠে ব্যথা হয়ে গেছে স্যার।'

'হোক, তবু তোমাকে শুয়ে থাকতে হবে এবং ঘুমাতে হবে।'

আরো দুদিন পর মিঠু ভাইয়া স্কুল-মাঠে এসে সরাসরি হেডস্যারের পা জড়িয়ে ধরেন এবং ফোঁত ফোঁত করে কাঁদতে থাকেন। হেডস্যার তারপর মাফ করে দেন মিঠু ভাইয়াকে।

ভীষণ ভয়ে আছি আমরা, অনতুকে আজ কীভাবে না-জানি শাস্তি দেওয়া হয়। আমার মনে হচ্ছে হেডস্যার প্রথমেই এসে টেবিলের ওপর রাখা কাগজের প্যাকেটের নিচ থেকে আনারসটা বের করবেন। তারপর সেটা অনতুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলবেন, 'অনতু, আমি জানি এটা তুমি কারো বাগান থেকে চুরি করে এনেছ। চুরি করা অন্যায়, সুতরাং সে অন্যায়ের শাস্তি হিসেবে তুমি এখনই এ আনারসটা খোসাসহ কামড়ে কামড়ে খাবে। এখনই খাবে, একটুও রাখা যাবে না, সবটুকু খাবে।'

ভাবতে ভাবতেই হেডস্যার এসে উপস্থিত হলেন। অন্য স্যাররাও সোজা হয়ে দাঁড়ালেন হেডস্যারের পাশে। হেডস্যার গম্ভীর হয়ে আছেন। মাথা নিচু করে থেকে কী যেন ভাবলেন তিনি। কিছুক্ষণ পর মাথাটা তুলে আমাদের দিকে তাকালেন। বেশ দূর থেকেও আমরা টের পাচ্ছি, স্যারের চোখ দুটো কেমন যেন লাল লাল। আমাদের হেডস্যারের অনেকগুলো অদ্ভুত অভ্যাসের মধ্যে একটা অদ্ভুত অভ্যাস হচ্ছে, কেউ অন্যায় করলে তিনি কখনো তা নিজ মুখে বলেন না, যে অন্যায় করে তার মুখ থেকেই তিনি সেটা বের করে আনেন।

হেডস্যার তাঁর ডান হাতটা মুখের কাছে নিয়ে খুক, করে একটু কেশে

বললেন, 'আমি সব অন্যায় সহ্য করতে পারি, একটা অন্যায় কখনোই সহ্য করতে পারি না।' স্যার ক্লাস নাইনের লাইনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শুভ, তুমি এদিকে আসো তো।'

শুভ ভাইয়া স্যারের সামনে গিয়ে সটান হয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'জি স্যার?'

'ক্লাস সিক্সে পড়ার সময় তুমি একটা অন্যায় করেছিলে।'

'জি স্যার।'

'অন্যায়টা সবাইকে বলো।'

'আমি ষান্মাসিক পরীক্ষার সময় আরেকজনের খাতা থেকে দেখে লিখেছিলাম।' শুভ ভাইয়া কিছুটা আস্তে করে বললেন।

'শুভ, তুমি সবার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে আরো একটু জোরে বলো।'

আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বেশ শব্দ করে শুভ ভাইয়া আগের কথাটাই বললেন। হেডস্যার বললেন, 'আমি শুভর এ অন্যায়টা ক্ষমা করে দিয়েছিলাম।'

হেডস্যার এবার ক্লাস টেনের লাইনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মহসীন, তুমি আসো এদিকে।'

মহসীন ভাইয়া হেডস্যারের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই স্যার বললেন, 'গত বছর তুমি একটা অন্যায় করেছিলে।'

'জি স্যার।' মহসীন ভাইয়া আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি আমাদের স্কুলের পেছনের একটা আমগাছ থেকে কাউকে না-বলে অনেকগুলো আম পেড়েছিলাম।'

হেডস্যার গম্ভীর হয়ে বললেন, 'মহসীনের এ অন্যায়টাও আমি ক্ষমা করে দিয়েছিলাম।'

ক্লাস এইটের লাইনের দিকে তাকিয়ে হেডস্যার এবার ডাকলেন রাজু ভাইয়াকে। রাজু ভাইয়া হেডস্যারের কাছে গিয়ে আমাদের দিকে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি একদিন ক্লাসে না এসে এবং কাউকে না-বলে স্কুলের বাইরে গিয়েছিলাম।'

'এবং বাইরে গিয়ে কোনো এক সিনেমা হলে সিনেমা দেখেছিলে।' হেডস্যার রাজু ভাইয়ার দিকে তাকিয়ে বলেন।

রাজু ভাইয়া মাথা নিচু করে বলেন, 'জি স্যার।'

'আমি রাজুর এ অন্যায়টাও ক্ষমা করে দিয়েছিলাম।' হেডস্যার গম্ভীরভাবে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলেন, 'কিন্তু অনতু যে অন্যায়টা করেছে তা ক্ষমার অযোগ্য। আমি কখনোই এ ধরনের অন্যায়কে ক্ষমা করতে পারব না, কখনোই

না।'

হেডস্যার অনতুর দিকে তাকালেন এবং বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'অনতু, এবার তুমি বলো, তুমি কী অন্যায় করেছ?'

কানে হাত রেখেই অনতু সবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি আমাদের টয়লেটের ভেতর সিগারেট খেয়েছিলাম।'

চারপাশের সবাই কেমন যেন ফিসফিস করে ওঠে। আমাদের কিছুটা পেছনে দাঁড়ানো টোটন আর ঝন্টুদের কে যেন ফিক করে হেসে ওঠে। বিটলু ফিসফিস করে বলে, 'এটা কী বলল অনতু!'

মৃদুল গলা চাপিয়ে বলে, 'অনতু সিগারেট খায় এটা আমরা জানতাম না তো!'

হেডস্যার সবাইকে ফিসফাস বন্ধ করতে বলে বললেন, 'আমার জীবনে আমি কখনো সিগারেট খাইনি, সিগারেট কী জিনিস তাও জানি না। ঠোঁটে চেপে টান দেওয়া তো দূরের কথা, হাতে নিয়েই দেখিনি কখনো। সিগারেট খেলে মুখ গন্ধ হয়ে যায়, শরীর গন্ধ হয়ে যায়, নিজের ক্ষতি হয়, অন্যের ক্ষতি হয়, দেশের ক্ষতি হয়, অর্থের ক্ষতি হয়—এ রকম একটা ক্ষতিকর জিনিস আমার এক ছাত্র গ্রহণ করবে, এটা আমি মানতে পারি না। সুতরাং তাকে শাস্তি পেতে হবে।' স্যার টেবিলের ওপরের কাগজের প্যাকেটটা সরালেন। আমরা অবাক হয়ে দেখি, একটা সিগারেটের প্যাকেট আর ম্যাচ রয়েছে সেখানে। স্যার জিনিসগুলো হাতে নিয়ে অনতুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি তো সিগারেট খেতে পছন্দ করো। এখানে যে কয়টা সিগারেট আছে তার সবগুলোই তুমি এখন একটার পর একটা খাবে আর আমরা সবাই সেটা চেয়ে চেয়ে দেখব। নাও, শুরু করো।'

কান থেকে হাত সরিয়ে অনতু সিগারেটের প্যাকেট আর ম্যাচটা হাতে নিল। অনেকক্ষণ যায়, কিন্তু সিগারেট আর মুখে দেয় না সে, আগুনও ধরায় না। হেডস্যার খুব স্বাভাবিক গলায় বলেন, 'অনতু, দেরি হয়ে যাচ্ছে, প্লিজ শুরু করো।'

অনতু তাও শুরু করে না। হেডস্যার হঠাৎ কিছুটা চিৎকার করে বলেন, 'অনতু, দেরি করছ কেন তুমি? এখনই শুরু করো, ক্লাস শুরু করতে হবে আমাদের।'

কাঁপা কাঁপা হাতে অনতু খুব ধীরে ধীরে একটা সিগারেট বের করে। তারপর একটু দেরি করে সেটা ঠোঁটের দিকে এগিয়ে নিতেই থেমে যায় সে। আমাদের সবার দিকে এক পলক তাকায়। পেছন থেকে রতন আর বাদল খিকখিক করে হাসছে। আর এটা বুঝতে পেরে বিটলু ফোঁস ফোঁস করছে,

অয়ন মাটির সঙ্গে পা গুতোচ্ছে, মৃদুল দাঁত দিয়ে নখ কামরাচ্ছে। কেবল আমারই কিছু মনে হচ্ছে না। আমার কেবল মনে হচ্ছে, অনতু কখনোই এতগুলো মানুষের সামনে সিগারেট মুখে দেবে না। তার আগেই একটা কিছু করে বসবে ও। এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত, ওকে চিনি না আমি!

হেডস্যার একটু এগিয়ে এলেন অনতুর দিকে। তা দেখে সিগারেটটা মুখের দিকে এগিয়ে নিচ্ছে অনতু। কিন্তু সেটা মুখের একেবারে কাছাকাছি নেওয়ার আগেই অনতু কেমন যেন কেঁপে উঠল। আমরা দেখতে পেলাম, তার শরীরটা দুলে উঠছে, সে দাঁড়াতে পারছে না, পা দুটো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে ওর এবং একসময় কাত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

অনতুকে মাটিতে পড়ে যেতে দেখেই চিৎকার করে উঠলেন হেডস্যার। আমাদের অঙ্ক স্যার আর ইংরেজি স্যারকে হাত দিয়ে ইশারা করে দ্রুত এগিয়ে আসতে বললেন। কিন্তু তাঁদের আসার আগেই হেডস্যার নিজেই এসে জড়িয়ে ধরলেন অনতুকে। পরম মমতায় ওকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে তিনি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন ওর মুখের দিকে। আর আমরা অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি, হেডস্যারের চোখ দিয়ে পানি পড়ছে, তিনি কাঁদছেন। অনতুকে দেখে নয়, বৃদ্ধ এ মানুষটার চোখে পানি দেখে পানি এসে গেল আমাদের চোখেও।

মোবারক চাচা আমাদের স্কুলের সবচেয়ে বড় পিয়ন। এ স্কুলের সবাই তাকে চাচা ডাকে, আমরাও ডাকি, হেডস্যারও ডাকেন। কারণ হেডস্যার যখন এ স্কুলে পড়তেন তখনো মোবারক চাচা এ স্কুলের পিয়ন ছিলেন।

বড় একটা খাতা হাতে নিয়ে মোবারক চাচা আমাদের ক্লাসে ঢুকলেন। আমাদের ক্যাপ্টেন সুমনকে খুঁজতে লাগলেন তারপর। সুমন এখনো ক্লাসে ঢোকেনি। আমাদের সঙ্গে স্কুলের মাঠে লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল, হয়তো বারান্দায় কারো সঙ্গে কথা বলছে।

বিটলু বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে মোবারক চাচার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'ফার্মের মুরগিকে খোঁজেন নাকি, চাচা?'

সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসের সবাই হেসে উঠল। আমাদের ক্লাস ক্যাপ্টেন সুমনকে আমরা ফার্মের মুরগি বলে ডাকি। ওকে ফার্মের মুরগি বলে ডাকার কারণটা হচ্ছে—ও শুধু ফার্মের মুরগির মতো স্বাস্থ্যবানই না, ফার্মের মুরগি যেমন যে জায়গায় খায় সেই জায়গাই ঘুমায়, সুমনও তেমনি শুধু ক্লাসে আসে আর ক্লাস শেষ হলেই হোস্টেলের রুমে গিয়ে ঢোকে। তারপর আর কোথাও যাওয়ার নাম নেই, কোনো রকম খেলাধুলাতেও নেই। টেবিলে বসে শুধু পড়া আর পড়া। আমাদের বিশ্বাস, ওর সামনে কেউ যদি পিপাসায় পানি পানি বলে চিৎকার করে মারা যায় কিংবা সমস্ত হোস্টেল যদি আগুন লেগে পুড়েও যায় তবু ও কোনো দিকে তাকাবে না, এমনকি পড়া বাদ দিয়ে ও চেয়ারও ছেড়ে উঠবে না।

মোবারক চাচা অবাক হয়ে বললেন, 'ফার্মের মুরগি খুঁজব কেন আমি, আর এখানে ফার্মের মুরগি আছে নাকি!'

'আছে চাচা, আছে।'

ক্লাসের এদিক ওদিক–তাকিয়ে মোবারক চাচা বেশ আগ্রহ নিয়ে বলেন, 'কোথায়?'

'খুব দেখতে ইচ্ছে করছে চাচা?'

'খুব না। ফার্মের মুরগি তো আমরা সব সময়ই দেখি, বাজারে দেখি, কিন্তু ক্লাসের ভেতর...!' মোবারক চাচা আগ্রহ নিয়ে আবার এদিক–ওদিক তাকান।

সুমন এমন সময় ক্লাসে ঢুকছিল। মোরাবক চাচা কিছু বলার আগেই বিটলু সুমনের একটা হাত টেনে ধরে চাচার একেবারে সামনে দাঁড় করিয়ে বলে, 'ওকে দেখে আপনার কী মনে হয়?'

হাসতে নিয়েই হাসিটা থামিয়ে ফেলেন চাচা। সঙ্গে সঙ্গে বিটলু বলে, 'বলুন? আমি যে আপনাকে এতক্ষণ বললাম, ওর যেমন স্বাস্থ্য, ওর মনটাও তেমন ভালো। কি বিশ্বাস হচ্ছে না আপনার?'

মুখটা হাসি হাসি করে মোবারক চাচা বলেন, 'হচ্ছে।'

'থ্যাংক ইউ। এবার আপনি ওর কাছে যে কাজে এসেছেন সেটা করুন, আমি আমার বেঞ্চে গিয়ে বসি।'

বিটলু এসে ওর বেঞ্চে বসল। মোবারক চাচা তাঁর হাতের খাতাটা সুমনের হাতে দিয়ে বললেন, 'এখানে একটা নোটিশ আছে, তুমি সবাইকে পড়ে শোনাও।'

খাতাটা হাতে নিল সুমন। আমাদের স্কুলের নিয়ম হচ্ছে, হেডস্যার কোনো নোটিশ দিলে সেটা পড়ে শোনানোর দায়িত্ব ক্লাস ক্যাপ্টেনের। ক্লাসে যদি কোনো টিচারও থাকেন, তবু ক্যাপ্টেনকে পড়ে শোনাতে হবে।

সুমন খাতাটা মেলে ধরল, তারপর পড়তে লাগল, 'প্রিয় ছাত্রবৃন্দ, তোমরা জেনে খুশি হবে, আজ তোমাদের স্কুলে নতুন একজন শিক্ষক আসবেন। তিনি ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াবেন। তিনি প্রথম ক্লাসটা শুরু করবেন সপ্তম শ্রেণী থেকে। আশা রাখি, তোমরা নতুন এই শিক্ষককে পেয়ে নতুন নতুন আরো অনেক কিছু শিখতে পারবে। স্নেহাশিস দিয়ে—তোমাদের প্রধান শিক্ষক।'

'সর্বনাশ!' বিটলু প্রায় চিৎকার করে ওঠে।

মোবারক চাচাকে নোটিশ খাতাটা ফেরত দিয়ে বিটলুর দিকে তাকাল সুমন। চাচা ক্লাস থেকে বের হয়ে যেতেই বিটলুর দিকে এগিয়ে এসে ও বলল, 'চিৎকার করে উঠলে কেন তুমি?'

'পিঁপড়া কামড় দিয়েছে আমাকে।' বিটলু চেহারাটা কুঁচকে খ্যাস খেসে গলায় বলল।

'পিঁপড়া!' সুমন অবিশ্বাস্য চোখে বিটলুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কোথায় কামড় দিয়েছে?'

'সেটা তো এখানে দেখাতে পারব না।'

'কেন?'

'এখানে দেখাতে অসুবিধা আছে।'

'তাহলে কোথায় দেখাতে পারবে?'

'বাথরুমে।'

সুমন একটু শব্দ করে বলে, 'বাথরুমে কেন?'

'এখানেও দেখাতে পারি। তুমি যদি বলো আমি দেখাব।' বিটলু খুব আন্তরিকতা নিয়ে বলে।

'দেখাও।'

সঙ্গে সঙ্গে প্যান্ট খুলতে থাকে বিটলু। কিন্তু কোমরের বোতামটা খুলতেই সুমন আগের চেয়ে শব্দ করে বলে, 'এটা কী করছ তুমি?'

'কেন, তোমাকে পিঁপড়ার কামড় দেখাচ্ছি!'

'পিঁপড়ার কামড় দেখাতে প্যান্ট খুলতে হয় নাকি!'

'পিঁপড়া যদি পাছায় কামড় দেয় তাহলে খুলতে হবে না!' বিটলু সুমনের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য সরাসরি ওর মুখের দিকে তাকায়।

'ঠিক আছে পিঁপড়ার কামড়ও দেখাতে হবে না, প্যান্টও খুলতে হবে না।' সুমন কিছুটা রেগে গিয়ে বিটলুর দিকে তাকিয়ে থাকে।

অনতু ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে সুমনের পিঠে একটা হাত রেখে বলে, 'প্লিজ, রাগ কোরো না। তুমি তোমার সিটে গিয়ে বসো।'

রাগী রাগী ভাব নিয়েই সামনের বেঞ্চের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল সুমন। সঙ্গে সঙ্গে পেছনের সব ছাত্র ফিসফিস শুরু করে দিল, কেউ কেউ মুখে হাত দিয়ে হাসতেও লাগল। কেবল আমি, অয়ন আর মৃদুল হাসলাম না। আমরা খুব স্বাভাবিক এবং সেই স্বাভাবিকভাবেই দেখলাম, সুমনের পিঠে একটা কাগজ লাগিয়ে দিয়েছে অনতু, একটা মোটাসোটা মুরগি আঁকা সেই কাগজে, নিচে বড় বড় করে লেখা—ফার্মের মুরগি।

বিটলু হঠাৎ অন্য রকম গলা করে বলল, 'ফার্মের মুরগি।' সঙ্গে সঙ্গে সুমন ঘুরে দাঁড়াল। কিন্তু বুঝতে পারল না কে কথাটা বলল। কারণ বিটলু তখন মাথা নিচু করে খুব মনোযোগ দিয়ে প্যান্টের বোতাম লাগাচ্ছে।

আর সাত-আট মিনিট পর ক্লাস শুরু হবে। এ সময় কিছুটা দুলে দুলে টোটন, ঝন্টু, রতন আর বাদল প্রবেশ করল ক্লাসে। সবার দিকে একবার তাকাল ওরা। তারপর ওদের বেঞ্চে না বসে স্যাররা চৌকির মতো উঁচু কাঠের ওপর যে জায়গাটায় দাঁড়িয়ে ক্লাস নেন সেখানে উঠল। রতন আর টোটন একসঙ্গে দাঁড়াল, বাদল আর ঝন্টু দাঁড়াল ওদের একটু পেছনে। মনে হচ্ছে আমাদের চারজন স্যার এসে দাঁড়িয়েছেন।

সবার দিকে আবার একটু ফিরে তাকাল টোটন। তারপর রতনের দিকে তাকিয়ে হেডস্যারের মতো গম্ভীর গলায় বলল, 'রতন, এবার তুমি বলো, তুমি কী অন্যায় করেছ?'

অনতুর মতো কানে হাত দিয়ে রতন সবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি আমাদের টয়লেটের ভেতর সিগারেট খেয়েছিলাম।'

টোটন আগের মতোই গলা গম্ভীর করে বলল, 'আমার জীবনে আমি কখনো সিগারেট খাইনি, সিগারেট কী জিনিস তাও জানি না। ঠোঁটে চেপে টান দেওয়া তো দূরের কথা, হাতে নিয়েই দেখিনি কখনো। সিগারেট খেলে মুখ গন্ধ হয়ে যায়, শরীর গন্ধ হয়ে যায়, নিজের ক্ষতি হয়, অন্যের ক্ষতি হয়, দেশের ক্ষতি হয়, অর্থের ক্ষতি হয়—এরকম একটা ক্ষতিকর জিনিস আমার এক ছাত্র গ্রহণ করবে, এটা আমি মানতে পারি না। সুতরাং তাকে শাস্তি পেতে হবে।'

টেবিলের ওপর কিছু নেই, তবু হাত দিয়ে ইশারা করে কী যেন সরাল টোটন। তারপর সেখান থেকে এমনি এমনি কী একটা জিনিস নিয়ে রতনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'তুমি তো সিগারেট খেতে পছন্দ করো। এখানে যে কয়টা সিগারেট আছে তার সবগুলোই তুমি খাবে আর আমরা সবাই সেটা চেয়ে চেয়ে দেখব। নাও, শুরু করো।'

রতনও এমনি এমনি টোটনের হাত থেকে সিগারেটের প্যাকেট নিল, কিন্তু কিছু করল না। টোটন বলল, 'রতন, দেরি হয়ে যাচ্ছে, প্লিজ শুরু কর।'

রতন কিছু করে না। টোটন হঠাৎ কিছুটা চিৎকার করে বলে, 'রতন, দেরি করছ কেন তুমি? ক্লাস শুরু করতে হবে তো আমাদের।'

ঠিক অনতুর মতো কাঁপা কাঁপা হাতে রতন খুব ধীরে ধীরে প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করার অভিনয় করে। একটু দেরি করে সেটা ঠোঁটের দিকে এগিয়ে নিতেই থেমে যায় সে। আমাদের সবার দিকে এক পলক তাকায়। তারপর সেটা আবার মুখের একেবারে কাছাকাছি নেওয়ার আগেই অনতুর মতো কেঁপে ওঠে রতন এবং হুবহু অনতুর মতোই শরীরটা দুলে উঠে ওর, দাঁড়াতে পারে না ও, পা দুটো এলোমেলো হয়ে যায় এবং একসময় কাত হয়ে পড়ে যায় সেই কাঠের চৌকির ওপর, ঠিক যেমনভাবে স্কুলের মাঠে পড়ে গিয়েছিল অনতু।

সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসের সবাই শব্দ করে হেসে ওঠে, রতন আর টোটনের অভিনয় দেখে অনেকে হাততালিও দেয়। কেবল আমরাই কিছু করতে পারি না, হাসতেও পারি না। একটু পর বিটলু লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে আমি ওর হাত টেনে ধরে বসতে বলি। কারণ জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, হেডস্যার আমাদের ক্লাসের দিকে আসছেন, তাঁর সঙ্গে অপরিচিত একজন নতুন মানুষও আসছেন।

টোটনরাও হেডস্যারকে দেখেছে। ওরা দ্রুত ওদের বেঞ্চে এসে বসার সঙ্গে

সঙ্গে হেডস্যারও ঢুকলেন আমাদের ক্লাসে। নতুন মানুষটিও ক্লাসে ঢুকে হেডস্যারের পাশে এসে দাঁড়ালেন। হেডস্যার পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'ইনি হচ্ছেন ইমরুল শরীফ, তোমাদের নতুন শিক্ষক। আজ থেকে তিনি তোমাদের একটা করে ক্লাস নেবেন।' হেডস্যার তারপর ক্লাসটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন আমাদের নতুন স্যারকে। আর কেউ না হোক, আমি খেয়াল করলাম অনতুকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় হেডস্যার পরম মমতায় ওর মাথায় একটা হাত রেখে আদর করে দিলেন, অথচ আর কারোরই মাথায় হাত রাখেননি তিনি।

হেডস্যার চলে যেতেই ইমরুল স্যার কাঠের চৌকিটার ওপর উঠে দাঁড়ালেন। তারপর সবার দিকে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখ করে বললেন, 'আমি তোমাদের কোন সাবজেক্টের ক্লাস নেব, তা কাল ঠিক হবে। আজ তোমাদের আমি কিছু সাধারণ জ্ঞানের কথা জিজ্ঞেস করব। আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে কে বলতে পারবে, পৃথিবীর আকার কী রকম?'

অনতু সবার আগে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাত উঁচু করে বলল, 'আমি পারব স্যার।'

'হাত উঁচু করার দরকার নেই, হাত নামিয়ে বলো। তার আগে তোমার নাম বলো আর রোল নম্বর বলো।'

'আমার নাম অনতু, আর রোল নম্বর...।'

'উঁহু, হলো না। ডাকনাম বললে তো হবে না, পুরো নাম বলো।'

'আমার পুরো নাম মো. মনোয়ারুল আমীন হক অনতু।'

'বাব্বাহ্, তিনজনের নাম তো তুমি একাই নিয়ে ফেলেছ। ঠিক আছে, এবার রোল নম্বর বলো।'

'১৩।'

'কত?'

'১৩।'

'তোমার রোল নম্বর ১৩?'

'জি স্যার।'

'গুড। এবার বলো পৃথিবীর আকার কী রকম?'

'পৃথিবীর আকার গোল, মানে গোলাকার।'

'গুড। কিন্তু তুমি কীভাবে প্রমাণ দেবে পৃথিবী গোলাকার?'

'খুবই সহজ স্যার।'

'যেমন?'

'অঙ্ক স্যার একদিন বলেছিলেন, পৃথিবীর আকার কেমন? বলেছিলাম,

লম্বা। তিনি কিছু না-বলে আমার গালে ঠাস করে একটা থাপ্পড় মেরেছিলেন। কিছুদিন পর ইংরেজি স্যার ওই একই কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। বলেছিলাম, চ্যাপ্টা। ইংরেজি স্যারও কিছু না-বলে প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়েছিলেন। তারও কয়েক দিন পর বাংলা স্যার জিজ্ঞেস করাতে বলেছিলাম, পৃথিবীর আকার চৌকোনা। বাংলা স্যার রেগে গিয়ে পুরো এক মিনিট কান মলে দিয়েছিলেন আমার। সেদিন বিজ্ঞান স্যার খুব আগ্রহ নিয়ে বললেন, কে বলতে পারবে পৃথিবীর আকার কেমন? আমিও খুব আগ্রহ নিয়ে বললাম, তিন কোনা। আমার উত্তর শুনেই বিজ্ঞান স্যার বিজ্ঞানসম্মতভাবে আমাকে শাস্তি দিলেন। তিনি আমার দু আঙুলের মাঝে একটা পেন্সিল রেখে চাপ দিতে লাগলেন আর আমিও চিৎকার করতে লাগলাম। সবশেষে আমি চিন্তা করে দেখলাম—পৃথিবী যেহেতু চ্যাপ্টা, লম্বা, চৌকোনা, তিন কোনা, কোনোটাই না, তাহলে অবশ্যই গোল, মানে গোলাকার হওয়া ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো উপায় দেখছি না স্যার।' অনতু কথাটা শেষ করে মিটিমিটি হাসতে থাকে।

'এটাই তোমার প্রমাণ?'

'এর চেয়ে ভালো প্রমাণ আর কোথায় পাব স্যার? তবে একটা কাজ করলে আরো ভালো একটা প্রমাণ দিতে পারতাম। '

'কী কাজ?'

'যদি একটা উড়োজাহাজ কিনতে পারতাম, তাহলে সেটাতে চড়ে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে বলতে পারতাম, পৃথিবীটা আসলে কেমন।'

ইমরুল স্যার অনেকক্ষণ অনতুর দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'অনতু, তুমি কি খুব দুষ্টু?'

'আপনার এ কথা মনে হলো কেন স্যার?'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন স্যার। তারপর বললেন, 'শোনো অনতু, না পারলে বারবার চেষ্টা করবে। অবশ্যই পারবে। অসম্ভব বলে কিছু নেই। বুঝেছ?'

'জি স্যার।'

'নেপোলিয়ন নামে একজন মানুষ ছিলেন, তুমি নেপোলিয়নকে চেনো তো?'

'নাম শুনে তো মনে হচ্ছে নাপিত ছিলেন।'

'না, তিনি নাপিত ছিলেন না। তিনি একজন বীর ছিলেন। তিনি সুন্দর একটা কথা বলেছিলেন—অসম্ভব এমন একটা শব্দ, যা কেবল বোকাদের ডিকশনারিতেই পাওয়া যায়।'

'তাই নাকি!' অনতু মুচকি মুচকি হেসে বলে, 'তা নেপোলিয়ন আঙ্কেল কি

কখনো চোখ বন্ধ না করে ঘুমানোর চেষ্টা করেছিলেন?'

অবাক হয়ে ইমরুল স্যার অনতুর দিকে তাকিয়ে থাকেন। ক্লাসে যে আরো ছাত্র আছে সেদিকে খেয়ালই করছেন না স্যার। বেশ কিছুক্ষণ পর তিনি অনতুকেই আবার বলেন, 'এবার অন্য রকম একটা প্রশ্ন করব তোমাকে। ধরো, রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে তুমি ৫০০ টাকার একটা নোট পেলে। তুমি কি টাকাটা তুলে নিজের কাছে রাখবে?'

'না স্যার।'

'গুড।' ইমরুল স্যার বেশ আনন্দ নিয়ে বলেন, 'তাহলে সে টাকাটা তুমি কী করবে?'

স্যারের চেয়েও আনন্দ নিয়ে অনতু বলে, 'ইচ্ছেমতো খরচ করব।'

বেশ কিছুক্ষণ আর কিছু বলেন না ইমরুল স্যার। চুপচাপ তাকিয়ে থাকেন অনতুর দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বের হয়ে যান ক্লাস থেকে।

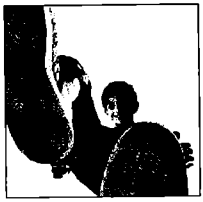

ক্লাস শেষ হওয়ার পর আমরা যার যার হোস্টেলে ফিরছিলাম। বিটলু হঠাৎ অনতুর পিঠে একটা থাপ্পড় মেরে বলে, 'সকালে তো ভালোই অভিনয় করলি রে অনতু।'

ফিক করে হেসে উঠে অনতু বলে, 'এটা আর কি, এর চেয়ে ভালো অভিনয় করতে পারি আমি।'

'আমার বিশ্বাসই হচ্ছিল না ওটা অভিনয় ছিল। আমি মনে করেছিলাম অনতু সত্যি সত্যি অজ্ঞান হয়ে গেছে।' অয়ন খুব সিরিয়াস ভঙ্গিতে কথাটা বলে।

'আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছিলাম।' অনতুর পেটে একটা খোঁচা মেরে বলি আমি।

'তুই বুঝতে পেরেছিলি!' অনতু অবাক হওয়ার মতো করে বলে।

'না বোঝার কি কোনো কারণ আছে?'

'হেডস্যারের চেহারা দেখেই বুকের ভেতর কলজেটা লাফাচ্ছিল, তার ওপর সব স্যারের সামনে সিগারেট খেতে হবে—এটা ভাবতেই মাথার ভেতর কেমন যেন চক্কর দিয়ে ওঠে। বুঝতে পারছিলাম ওই মুহূর্তে কী করা উচিত আমার। হঠাৎ মাথার ভেতর অজ্ঞান হওয়ার ভাবনাটা আসতেই অভিনয়টা করে ফেললাম আমি।' অনতু শব্দ করে হাসতে থাকে।

'আচ্ছা, তুই সিগারেট পেলি কোথায়?' মৃদুল অনতুর কাঁধে একটা ধাক্কা মেরে বলে।

'রাতে আনারস চুরি করে আসার সময় রাস্তায় পড়ে থাকা একটা সিগারেটের প্যাকেটের সঙ্গে পা লাগে আমার। কেমন যেন ভারী ভারী মনে হয় প্যাকেটটা। হাতে তুলে নিয়ে দেখি প্যাকেটের ভেতর কয়েকটা সিগারেট।' অনতু বলে।

'আমাদের জানাসনি কেন?' বিটলু কিছুটা রাগ করে বলে।

'তোদের বললে কি তোরা প্যাকেটটা নিতে দিতি?'

'অবশ্যই না। তুই খুব অন্যায় একটা কাজ করেছিস। সিগারেট খাওয়া

অসম্ভব খারাপ জিনিস, এটা জেনেও তুই সেই জিনিসটাই খেলি!'

'আমি কি সত্যি সত্যি খাচ্ছিলাম নাকি। বাথরুমে গিয়ে একটা সিগারেট মুখে নিয়ে আগুন ধরাতেই খুক্ খুক্ করে কেশে উঠি আমি। এমন সময় হেডস্যার সেদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমার খুক্ খুক্ শব্দ শুনে জিজ্ঞেস করেন কে? আমি দ্রুত সিগারেটা নিভিয়ে দরজা খুলতেই স্যার নাক কুঁচকে বলেন, সিগারেটের গন্ধ পাচ্ছি, সিগারেট খাচ্ছিলে নাকি তুমি? তারপর স্যার আমাকে ঠেলে বাথরুমে ঢুকে সিগারেটের প্যাকেটটা দেখে ফেলেন।'

'আমরা যা-ই করি না কেন, লেখাপড়ায় আমরা কিন্তু ভালোই। তোর সিগারেট খাওয়া দেখার পর স্যার এখন কি-না-কি ভাবেন।' বিটলু খুব গম্ভীর হয়ে বলে।

'কী আর ভাববেন, ভাববেন আমরা গোল্লায় গেছি।' অনতু খিক খিক করে হাসতে হাসতে বলে।

'সেটা কি ভালো জিনিস হলো?' মৃদুল বলে।

অনতু হাঁটতে হাঁটতে ঘুরে দাঁড়িয়ে আমাদের সবার দিকে তাকিয়ে বলে, 'ব্যাপারটা নিয়ে তোরা ভাবিস না, আমি হেডস্যারকে সব বলে ঠিক করে ফেলব।'

'সব বলবি মানে, রাতে যে মাঝে মাঝে আমরা বাইরে যাই, সেটাও বলবি নাকি!' বিটলু চমকে উঠে বলে।

'মাথা খারাপ, সেটা আবার কেউ বলে নাকি!'

আমি অনতুর একটা হাত চেপে ধরে বলি, 'তোকে এখন একটা কথা বলব, সত্যি করে উত্তর দিবি তুই।'

'সত্যি করেই দিতে হবে?' অনতু হাসতে হাসতে বলে।

'হ্যাঁ, সত্যি করেই দিতে হবে।'

কিছুক্ষণ অনতু কী যেন ভাবে, তারপর বলে, 'বল।'

'আমি খেয়াল করে দেখেছি, আমাদের সবার চেয়ে হেডস্যার তোকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। তুই কি বলবি তোকে কেন বেশি ভালোবাসেন?' আমি কথাটা বলে অনতুর চোখের দিকে তাকাই।

অনতুর চোখ দুটো হঠাৎ ছলছল করে ওঠে, কিন্তু ও কিছু বলে না। মাথা নিচু করে কী যেন ভাবে। আমি অনতুর হাতটা আরো একটু চাপ দিয়ে বলি, 'অসুবিধা থাকলে বলার দরকার নেই।' অনতু তবু কিছু বলে না। প্রসঙ্গটা দ্রুত অন্যদিকে নেওয়ার জন্য আমি অনতুর হাতটা ছেড়ে দিয়ে সবার দিকে তাকিয়ে বলি, 'রতনদের একটা কিছু করা দরকার যে।'

বিটলু সঙ্গে সঙ্গে বলে, 'একটা কিছু মানে! ওদের এমন কিছু করা দরকার, যাতে আমাদের পেছনে কখনো আর লাগতে সাহস না পায়।'

'কিন্তু কী করা যায়, বল তো?' মৃদুল বলে।

'তার আগে আমাদের জানতে হবে, রতনরা রাতে কোথায় যায়?' অয়ন চোখ দুটো বড় বড় করে বলে।

'ঠিক। অনেকক্ষণ ধরে আমি সে কথাটাই ভাবছিলাম, রতনরা রাতে কোথায় যায়।' বিটলুও চোখ বড় বড় করে বলে।

'আমার মনে হচ্ছে অনেক দিন পর আমরা একটা কাজ পেতে যাচ্ছি।' আমি সবার দিকে তাকিয়ে বলি।

'কাজ! কী ধরনের কাজ?' মৃদুল খুব আগ্রহ নিয়ে বলে।

'কাজটা হলো, রতনরা রাতে কোথায় যায় সেটা খুঁজে বের করা।' আমি আবার সবার দিকে তাকাই।

'ঠিক, এ কাজটা আমাদের করতেই হবে।' মৃদুল আগের মতোই আগ্রহ নিয়ে বলে।

'এবং আজ রাত থেকেই করতে হবে।' বিটলু কিছুটা লাফিয়ে উঠে শব্দ করে বলে।

রাত দেড়টার দিকে মৃদুল আমার রুমে ঢুকে ফিসফিস করে বলে, 'একটা ভয়ঙ্কর জিনিস দেখেছি আমরা। তাড়াতাড়ি ওঠ।'

দ্রুত বিছানায় উঠে বসি আমি। তারপর বলি, 'কী দেখেছিস?'

'আগে বাইরে বের হয়েই আয় না।'

রুম থেকে বের হয়ে এসে দেখি বিটলু, অনতু আর অয়ন দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। ওরা কেমন যেন উদ্বিগ্ন। আমি বিটলুর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'কী হয়েছে?'

'ব্যাপারটা আসলে ভালো বুঝতে পারছি না আমরা।' বিটলু আমার হাত টেনে ধরে বলে, 'চল, তোকে আগে জিনিসটা দেখাই।'

আমাদের ছাত্রদের চার হোস্টেলের পাশে বড় একটা হোস্টেল আছে। সেখানে সাধারণত ব্যাচেলর টিচাররা থাকেন। আমরা সে হোস্টেলের দিকে এগোতে লাগলাম।

হোস্টেলের কাছাকাছি আসতেই বিটলু আমার হাত টেনে ধরল। তারপর স্কুল-মাঠের পাশে হাসনাহেনা গাছের আড়ালে গিয়ে বসে পড়ল ও। আমি,

অয়ন, অনতু আর মৃদুলও বসে পড়লাম ওর পাশে। একটু পর বিটলু ফিসফিস করে বলল, 'সামনের দিকে তাকা।'

'সামনের দিকে কোথায় তাকাব?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'স্যারদের হোস্টেলের দিকে।'

খুব আগ্রহ নিয়ে আমি সামনে স্যারদের হোস্টেলের দিকে তাকালাম। এখান থেকে বেশ দূরে স্যারদের হোস্টেল। হোস্টেলের বারান্দায় মিটমিট করে অল্প আলোর একটা লাইট জ্বলছে। তেমন কিছু দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে, বোঝাও যাচ্ছে না। আমি তবু আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে রইলাম।

একটু পর বিটলু আমার পিঠে একটা হাত রেখে বলল, 'চিন্তা করিস না, জিনিসটা এখনো দেখা যেতে পারে, আবার একটু পরও দেখা যেতে পারে।'

কিছুটা বিরক্ত হয়ে আমি বললাম, 'জিনিসটা আসলে কী?'

'সেটা তো আমরাও জানি না।'

'তোরা জানিস না মানে, তাহলে আমাকে ডেকে আনলি কেন?'

'তোকে ডেকে আনা হয়েছে এ জন্য যে, জিনিসটা দেখে তুই চিনতে পারিস কি না সে জন্য।' অনতু চিবিয়ে চিবিয়ে বলে।

'জিনিসটা দেখতে কেমন?'

'সেটাও তো আমরা বুঝতে পারছি না।'

কথাটা বলতে বলতে আমরা দেখতে পেলাম স্যারদের হোস্টেল-রুমের একটা দরজা খুলে গেল। রুমের লাইট জ্বালানো নেই, বারান্দার মিটমিট আলোতে কেবল দেখা গেল, লম্বামতো কী যেন একটা সেই দরজা দিয়ে বের হয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। পরক্ষণেই সেটা আবার রুমের ভেতর ঢুকে গেল।

বিটলু বলল, 'কিছু বুঝতে পারলি?'

'ভালো করে দেখতেই তো পেলাম না।'

'আমরাও দেখতে পাইনি। কিছুক্ষণ আগে আমরা যখন এখান দিয়ে তোর কাছে যাচ্ছিলাম, তখন প্রথমে মৃদুল দেখে জিনিসটা। আমরা তো প্রথমে বিশ্বাসই করিনি। ওকে বলেছিলাম, ভুল দেখেছিস তুই। ও বলল, একটু অপেক্ষা করে দেখি। আমরা তখন এই হাসনাহেনা গাছের আড়ালেই বসে ছিলাম। কিছুক্ষণ পরই দেখি আবার ওভাবে লম্বামতো জিনিসটা বারান্দায় এসে দাঁড়াল, একটু পর আবার রুমের ভেতর ঢুকে গেল।' বিটলু কিছুটা ভয় ভয় গলায় বলল।

আমি বিটলুর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'ভয় পেয়েছিস নাকি তুই?'

'ঠিক ভয় না, কেমন যেন লাগছে।'

'আচ্ছা, আমরা একটু এগিয়ে যাব নাকি?'

'কোথায়?' অনতু জিজ্ঞেস করল।

'স্যারদের হোস্টেলের দিকে।' আমি বললাম।

'এখনই যাওয়া ঠিক হবে না। আরো একটু দেখি।' মৃদুল আমার হাতে একটা চাপ দিয়ে বলল।

আমরা আবার আগ্রহ নিয়ে বসে রইলাম। কিন্তু অনেকক্ষণ বসে থাকার পরও কিছু দেখা গেল না। অয়ন একটু নড়েচড়ে বসে বলল, 'চল, আর বোধহয় দেখা যাবে না।'

'না, আরো একটু বসি।' বিটলু বলল।

'অনেকক্ষণ তো বসে রইলাম।'

'আর একটু।'

'আচ্ছা, জিনিসটা আসলে কী হতে পারে বল তো?' আমি সবার দিকে তাকিয়ে বললাম।

'ভালো করে তো দেখাই হলোই না, বুঝব কী করে জিনিসটা কী?' মৃদুল বলল।

'জিনিসটা তো আর দেখা যাচ্ছে না। স্যারদের হোস্টেল-রুমের দিকে চল না একটু এগিয়ে যাই।' সবাইকে বলি আমি।

'এখন যাব, না একটু পরে যাব?' বিটলু বলে।

'এখন গেলে অসুবিধা কী?'

'অসুবিধা নাই, তবে আমাদের একটু সাবধানে যেতে হবে।'

'শুধু সাবধানে না, এমনভাবে যেতে হবে, যেন আমাদের কেউ দেখতে না পায়।' অনতু বলল।

'হ্যাঁ। আমরা এমনভাবে এগোতে থাকব, ওই জিনিসটা যদি আবার হঠাৎ করে রুম থকে বের হয়ে আসে তাহলে যেন আমাদের দেখতে না পায়।' অয়ন সবাইকে সাবধান করে দেওয়ার মতো করে বলে।

'শুধু ওই জিনিসটা না, হেডস্যার মাঝে মাঝে তাঁর বাসা থেকে রাতে আমাদের সবগুলো হোস্টেল দেখতে আসেন; আমাদের সাবধান হতে হবে, হেডস্যারও যেন আমাদের না দেখেন।' অনতু বলে।

'তা ছাড়া নাইডগার্ড আঙ্কেলও দেখে ফেলতে পারেন।'

'সেটার অবশ্য আসঙ্কা নেই, কারণ নাইটগার্ড আঙ্কেল বেশির ভাগ সময় ঘুমিয়েই থাকেন, একেবারে ঘোড়ার মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমান।' বিটলু

বলে।

'তাহলে চল, এগোতে শুরু...।'

কথাটা আমাকে শেষ করতে দেয় না অনতু। আমার একটা হাত চেপে ধরে ও। স্যারদের হোস্টেল থেকে ওই জিনিসটা আবার বের হয়েছে। জিনিসটা এবার বারান্দায় এসে থামল না, বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে স্কুল-মাঠে নেমে এলো এবং হাঁটতে লাগল মাঠের মাঝখান দিয়ে।

জিনিসটা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। অয়ন ভয় ভয় গলায় বলল, 'কী রে, এদিকে আসছে কেন?'

বিটলু হাসি হাসি গলায় বলল, 'তোর সঙ্গে দেখা করতে।'

অয়ন বিরক্ত হয়ে বলল, 'এ সময়ও তুই হাসছিস?'

'হাসব না তো চিৎকার করে কাঁদব?'

'তোর ভয় করছে না?'

'হ্যাঁ, করছে।' বিটলু অয়নের দিকে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখ করে বলে, 'চিৎকার করে সবাইকে জাগিয়ে তুলি?'

'চুপ কর তো তোরা!' অনতু বেশ সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলে, 'জিনিসটা তো একেবারে কাছে এসে গেছে আমাদের।'

'আসুক। কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে সবাই মিলে জাপটে ধরব।' বিটলু বেশ সাহস নিয়ে বলল।

বিটলুর কথাটা শুনতে পেয়েই কিনা, জিনিসটা আমাদের আরো একটু কাছে এসে ঘুরে দাঁড়াল। কিন্তু তার আগেই আমরা হাসনাহেনা গাছের আড়াল থেকে জিনিসটা ভালো করে দেখে ফেললাম। মানুষের মতো দেখতে জিনিসটা, পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা চাদর দিয়ে ঢাকা তার।

অনতু ফিসফিস করে বলল, 'এটা তো মানুষ মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, মানুষের মতোই তো হাঁটছে।' মৃদুল বলে।

কিন্তু কাউকে কিছু না বলে অনতু বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সোজা দৌড়ে গেল মানুষটার কাছে। ভয়ে আমি চিৎকার করে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু গলা দিয়ে কোনো স্বর বের হলো না। মানুষটা হাঁটছে, অনতুও তার পাশে পাশে হাঁটছে। কিছুদূর যাওয়ার পরই অনতু লোকটার চাদর টেনে ধরল। লোকটা তবু হেঁটে যাচ্ছে, কিন্তু চাদরটা রয়ে গেল অনতুর হাতে, লোকটা হাঁটছেই।

লোকটার চেহারাটা আমরা এখান থেকে অল্প অল্প দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু অনতু কাছ থেকে চেহারাটা ভালো করে দেখে সোজা দৌড়ে এলো আমাদের

কাছে। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ওই লোকটার চেহারা কি তোরা দেখেছিস?'

'এখান থেকে তেমন দেখতে পাইনি।' মৃদুল বলল।

মৃদুলের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অয়ন বলল, 'তুই তো দেখেছিস, চিনেছিস নাকি লোকটাকে?'

'হ্যাঁ।'

আমরা চারজন প্রায় একসঙ্গে বললাম, 'কে?'

ঘাসের ওপর ঠাস করে বসে পড়ে অনতু বেশ চিন্তাযুক্ত হয়ে বলে, 'লোকটা হচ্ছে আমাদের নতুন স্যার।'

ঝট করে আমরা সামনের দিকে তাকাই। লোকটা, মানে আমাদের নতুন স্যার রুমের বারান্দায় উঠে পড়েছেন। তারপর হাঁটতে হাঁটতে রুমে ঢুকে বন্ধ করে দিলেন দরজাটা।

বিটলু আর অনতু হাই-বেঞ্চের সঙ্গে মাথা ঠেকিয়ে বসে আছে ক্লাসে। ওরা ঘুমাচ্ছে। কারণ কাল রাতে আমাদের কারোই ঘুম হয়নি, একটুও হয়নি। নতুন স্যারকে ওভাবে দেখে আমরা কিছুই চিন্তা করতে পারছিলাম না। সারাক্ষণ কেবল ভেবেছি, ওটা কী স্যার ছিলেন, না অন্য কেউ।

মৃদুলদের হোস্টেলের পাশে ছোট্ট একটা দেয়ালেঘেরা জায়গা আছে। আমরা এ জায়গাটার নাম দিয়েছি গোপন চত্বর। আমাদের অনেক গোপন কথাই আমরা এখানে আলোচনা করি। হাঁটতে হাঁটতে স্যার রুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করার পর রাতেই আমরা এখানে এসে বসে ছিলাম, অনেকক্ষণ বসে ছিলাম। কিন্তু কোনো কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি। অনতু তো একবার রেগে গিয়ে বলল, 'অত কিছু চিন্তা করার দরকার নেই। চল, স্যারের হোস্টেলে গিয়ে ডেকে তুলে স্যারকে জিজ্ঞেস করি।'

বিটলু সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসে বলল, 'আমিও সেটা ভাবছি। এত কিছু চিন্তা না করে স্যারকে ডেকে তুলে জিজ্ঞেস করাই ভালো।'

দুজনের দিকে তাকিয়ে মৃদুল গলাটা একটু গম্ভীর করে বলল, 'স্যারকে ডেকে তোলার পর কী জিজ্ঞেস করবি?'

'জিজ্ঞেস করব, স্যার, আপনি কি একটু আগে রুমের বাইরে বের হয়েছিলেন?' বিটলু বলে।

'এতে জিজ্ঞেস করার কী আছে। আমরা তো দেখলামই ওটা স্যার ছিলেন। তা ছাড়া স্যারের গায়ের চাদরটাও কিন্তু আমাদের হাতে ছিল, যা অনতু স্যারের গা থেকে খুলে নিয়েছিল।' মৃদুল বলে।

'ঠিক খুলে নিয়েছিলাম না, চাদরটা টেনে ধরার পরও স্যার হাঁটতে লাগলেন, তারপর সেটা খুলে গেল।' অনতু যুক্তি দেখাল।

'চাদরটা তো ভাঁজ করে স্যারের রুমের বারান্দার সামনে রেখে এসেছি আমরা, যাতে সকালে ঘুম থেকে উঠেই সেটা দেখতে পান তিনি, তাই না?' অয়ন বলে।

'হ্যাঁ।' বিটলু আবার বলে, 'স্যারকে ডেকে তুলে তবু জিজ্ঞেস করব। আমার কেমন যেন লাগছে। কে ওই লোকটা? ওটা কি আমাদের নতুন স্যার,

না অন্য কেউ?'

'সেটা তো পরেও জানা যাবে।' মৃদুল বলে।

'পরের কথা পরে।'

'পরের কথা পরে মানে! আরে গাধা, এখন যদি আমরা স্যারকে ডেকে তুলে কিছু জিজ্ঞেস করতে যাই, তখন স্যার যদি আমাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমরা এত রাতে বাইরে কেন?' আমি বললাম।

'আমরা একটা কিছু বলব।' বিটলু কিছুটা গোঁয়ার্তুমি করে বলে।

'একটা কিছু কী বলবি?'

'আহ্ এত কথা বলিস না তো! তখন মনে যা আসে তা-ই বলা যাবে।' অনতুও বিটলুর মতোই গোঁয়ার্তুমি করে বলে।

'মনে যা আসে তা নাহয় বললি, কিন্তু কথাটা যখন হেডস্যারের কানে যাবে তখন কী বলব আমরা?' মৃদুল রাগী রাগী গলায় বলে।

'কথাটা হেডস্যারের কানে যাবে কেন?'

অয়ন অনতুর পেটে একটা গুঁতো দিয়ে বলে, 'বারে, নতুন স্যার ব্যাপারটা জানবেন, আর হেডস্যার জানবেন না!'

'এখন আমরা তাহলে কী করব?' বিটলু অয়ন, মৃদুল আর আমার দিকে তাকিয়ে বলে।

'কিছুই করব না। যা করার কাল করব।' কথাটা বলেই গোপন চত্বর থেকে উঠে দাঁড়াই।

আমার সঙ্গে সঙ্গে অন্য সবাই উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু কয়েক পা যাওয়ার পর অনতু আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, 'তোরা যা, আমি আরো কিছুক্ষণ থাকব এখানে।'

'আমিও থাকব।' কথাটা বলে বিটলু আমাদের কাছ সরে গিয়ে অনুতর গা ঘেঁষে দাঁড়ায়।

'কাজটা কি ভালো হবে?' মৃদুল রাগ চেপে রেখে বেশ গম্ভীর গলায় অনতু আর বিটলুকে বলে।

'ভালো হোক আর খারাপ হোক, সেটা কাল চিন্তা করব। আমরা সবকিছু ভালোভাবে না জেনে রুমে ফিরছি না।' বিটলু অনতুর একটা হাত ধরে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। আমরা কিছুক্ষণ ওদের দিকে তাকিয়ে থেকে যার যার রুমে ফিরে এলাম।

সকালে স্কুল-মাঠের লাইনে এসেই দেখি বিটলু আর অনতু কেমন যেন ঝিমোচ্ছে। আমরা কিছুই জিজ্ঞেস করিনি ওদের। আমি, মৃদুল আর অয়ন সিদ্ধান্ত নিয়েছি জিজ্ঞেস করবও না। স্কুল-মাঠ থেকে এসে ওরা যখন ক্লাসে

ঢুকল তখনো কিছু জিজ্ঞেস করিনি আমরা, ওরাও কিছু বলেনি। সোজা সিটে এসে বসে হাই বেঞ্চের সঙ্গে মাথা ঠেকিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার আগে বিটলু একবার সবাইকে শাসন করার গলায় বলেছিল, 'আমরা এখন ঘুমাব। খবরদার, কেউ ডাকবি না।'

ক্লাসে যে ঢুকছে সে-ই অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে বিটলু আর অনতুকে। ঝন্টু, বাদল, রতন আর টোটনকে হেলেদুলে ক্লাসে ঢুকতে দেখেই চমকে উঠলাম আমরা। কিন্তু প্রথমে ওরা তেমন কিছু খেয়াল করল না, একটু পর বিটলু আর অনতুর দিকে তাকিয়েই হাসাহাসি করতে লাগল। রতন আবার এরই মধ্যে ঝন্টুর কানের কাছে মুখ নিয়ে কী যেন বলল ফিসফিস করে, তারপর এগিয়ে আসতে লাগল বিটলুদের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে অয়ন আর মৃদুল উঠে দাঁড়াল, ওদের দেখাদেখি উঠে দাঁড়ালাম আমিও। ঝন্টুরা থমকে দাঁড়াল। ওরা খেয়াল করল না, কিন্তু আমরা খেয়াল করলাম নতুন স্যার ঢুকছেন ক্লাসে এবং ঢুকেই তিনি ঝন্টুদের সিটে বসতে বলে চৌকির মতো জায়গাটায় উঠে দাঁড়ালেন। আমি, অয়ন আর মৃদুল অবাক চোখে তাকিয়ে রইলাম স্যারের দিকে। আমরা এই মানুষটাকেই রাতে হোস্টেল-রুম থেকে বের হতে দেখেছিলাম? না অন্য কাউকে? আমরা কোনোভাবেই বিশ্বাস করতে পারছি না আমরা আমাদের নতুন স্যারকেই দেখেছি! অথচ সত্য হচ্ছে, আমরা আমাদের এই নতুন স্যারকেই দেখেছি, একশ পার্সেন্ট সত্য আমরা তাকেই দেখেছি।

নতুন স্যার নাম ডাকার খাতাটা খুলেই সামনে বসে থাকা সবার দিকে তাকালেন। তারপর হাসি হাসি মুখ করে বললেন, 'কেমন আছ তোমরা, রাতে ভালো ঘুম হয়েছে তো তোমাদের?'

ঝন্টু বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে চেহারাটা কৃত্রিম গম্ভীর করে বলল, 'আমরা তো ভালোই আছি, ঘুমও হয়েছে ভালো, কিন্তু কারো কারো মনে হয় ভালো ঘুম হয়নি স্যার।'

'কার কার ভালো ঘুম হয়নি?' নতুন স্যার জিজ্ঞেস করেন।

হাত দিয়ে ইশারা করে বিটলু আর অনতুকে দেখায় ঝন্টু। স্যার বাঁ দিকে মাথাটা একটু কাত করে ওদের দিকে তাকিয়েই চোখ দুটো ছোট ছোট করে ফেলেন। তারপর নাম ডাকার খাতাটা টেবিলের ওপর রেখে তিনি সোজা চলে আসেন বিটলু আর অনতুর বেঞ্চের কাছে। ক্লাসের সবাই প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে আছে বিটলুদের দিকে।

স্যার বিটলুর মাথায় একটা হাত রাখেন। একটু পর অনতুর মাথায়ও হাত রাখেন। কিন্তু দুজনের কেউই টের পায় না কিছু। স্যার এবার সুড়সুড়ি দেওয়ার মতো বিটলুর চুলে হাত রাখেন, বিটলু বেঞ্চে মাথা রেখে ঘুমানো

অবস্থাতেই হাত দিয়ে ওর মাথা থেকে স্যারের হাতটা ঝটকা দিয়ে সরিয়ে দেয়। স্যার এবার অনতুর মাথায় সুড়সুড়ি দিতে থাকেন, বিটলুর মতো অনতুও বিরক্তি নিয়ে নিজের মাথা থেকে স্যারের হাতটা সরিয়ে দেয়। ওদের দিকে হাসি হাসি মুখ করে তাকিয়ে আছেন স্যার, মনে হচ্ছে এ মুহূর্তে কী করা উচিত তা বুঝতে পারছেন না তিনি।

আমাদের ফার্মের মুরগি থুক্কু ক্যাপ্টেন সুমন উঠে দাঁড়িয়ে স্যারকে বলল, 'স্যার, আমি কি ওদের ডেকে ওঠাব?'

'না, আমি ওঠাচ্ছি।' স্যার সুমনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি কি জানো ওরা কেন ঘুমাচ্ছে?'

'না স্যার।'

'কিন্তু ক্লাস ক্যাপ্টেন হিসেবে তোমার জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল।'

সুমন ফার্মের মুরগির মতো মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'জি স্যার।'

মৃদুল, আমি আর অয়ন ফিক করে হেসে ফেললাম। সুমন যদি বিটলু আর অনতুকে এই ঘুম নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করত তাহলে ওর খবর ছিল। বেশ কয়েক দিন আগে বিটলু আর অনতু বাদাম খেতে খেতে ক্লাস-রুমে ঢুকছিল। ক্লাসের ভেতর কোনো কিছু আবার খাওয়া নিষেধ আছে আমাদের স্কুলে। বিটলু আর অনতুকে দেখে সুমন কিছুটা দৌড়ে এসে বলল, 'এটা কী করছ তোমরা?'

বিটলু একটা বাদাম ছিলে সেটা মুখ দিতে দিতে বলল, 'কী করছি তুই তা দেখতে পাচ্ছিস না?'

'দেখতে তো পাচ্ছি।'

'তাহলে?'

'ক্লাসের ভেতর তো কোনো কিছু খাওয়া নিষেধ আছে।' সুমন চোখমুখ কুঁচকে বলে।

'কে নিষেধ করেছে?'

'কেন, হেডস্যার।'

'হেডস্যার নিষেধ করেছেন, তা তুই চিল্লাচ্ছিস কেন?' অনতু বাদাম ছিলে মুখে দিতে দিতে বলে।

'আমি তো এ ক্লাসের ক্যাপ্টেন।'

'ক্যাপ্টেন হয়েছিস বলেই চিল্লাতে হবে?'

'ক্যাপ্টেনরা অনেক কিছু করতে পারে।' সুমন কেমন যেন একটু গর্ব নিয়ে বলে।

'কী কী করতে পারে?' বিটলু বলতে বলতে সুমনের দিকে এগিয়ে এসে

ওর একেবারে চোখের দিকে তাকায়।

'আমি ইচ্ছে করলে তোমাদের এ ক্লাসরুম থেকে বের করে দিতে পারি, এখনই দিতে পারি।'

বিটলু আরো একটু এগিয়ে এসে বলে, 'দে তো?'

সুমন আর কিছু বলে না, কিছু করেও না। কেমন যেন ভয় পেয়ে যায় ও। মুখটা ফ্যাকাসে দেখায় ওর। অনতু এবার সুমনের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলে, 'তুই যে কিছু করতে পারবি না তা তো জানি, কিন্তু আমরা কী করতে পারি তা কি তুই জানিস?'

মাথা নিচু করে ফেলে সুমন। কিছু বলে না।

আমাদের স্কুলের পাশে বেশ বড় একটা জঙ্গল আছে। সেই জঙ্গলে একটা জিনিস আছে। সেদিন ক্লাস শেষ করে আমরা পাঁচজনই জিনিসটা নিয়ে আসি। জিনিসটা হলো কাঁচা তেঁতুলের মতো একটা জিনিস। এটার খোসার গুঁড়ো শরীরের যে জায়গায় লাগে সেই জায়গা চুলকাতে চুলকাতে ছিলে ফেললেও চুলকানি থামে না।

ক্লাস শেষে প্রতিদিন আমাদের স্কুলড্রেস যার যার হলরুমের বারান্দায় মিলে দিই আমরা। পরের দিন সকালে সেটা আবার পরে ক্লাসে আসতে হয় আমাদের। বিকেলে চুপি চুপি আমরা সেই ফলের খোসার গুঁড়ো নিয়ে সুমনের প্যান্টের ভেতর মেখে দিয়ে আসি। পরের দিন সকালে স্কুল-মাঠের লাইনে দাঁড়ানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই সুমন চিৎকার শুরু করে দেয়। স্যাররা বলেন, কী হয়েছে, কী হয়েছে? ও কিছুই বলে না, কেবল প্যান্টের ওপর দিয়ে চুলকাতে থাকে। শেষে সহ্য করতে না পেরে দৌড়ে রুমের দিকে চলে যায়। রাতে আমরা বেড়ানোর নাম করে সুমনের রুমে ঢুকি। এটা-ওটা কথা বলি। এরই মাঝে বিটলু ফিসফিস করে বলে, 'চুলকানির মজা কেমন রে সুমন?'

এর পর থেকে সুমন আর সহজে আমাদের সঙ্গে কথা বলে না। ক্লাসের ভেতর কোনো অন্যায় করলে প্রতিবাদও করে না।

নতুন স্যার আবার বিটলুর মাথায় হাত রেখে সুড়সুড়ি দিতে থাকেন। বিটলু আবার ওর হাত দিয়ে স্যারের হাতটা ঝটকা মেরে সরিয়ে দেয়। স্যার অনতুর মাথায় হাত রেখে সুড়সুড়ি দিতে থাকেন, অনতুও একই কাজ করে। শেষমেশ স্যার দু হাত দিয়ে দুজনের মাথায় একটু জোরে করেই একটা থাপ্পড় দেন। সঙ্গে সঙ্গে বিটলু আর অনতু প্রায় একসঙ্গে লাফিয়ে উঠে যে থাপ্পড় দিয়েছে তাকে কী যেন বলতে নেয়, কিন্তু সামনে স্যারকে দেখেই চমকে ওঠে ওরা। বিটলু চোখ দুটো বড় বড় করে ফেলেছে, তবে অনতুরা সারা মুখে হাসি। ওর হাসি হাসি মুখ দেখে স্যার বেশ গম্ভীর গলায় বললেন, 'ক্লাসের ভেতর ঘুমাচ্ছ,

আবার হাসছ!'

'স্যার, আপনাকে কে বলল আমরা ঘুমাচ্ছি?' অনতু হাসি হাসি মুখ করেই বলে।

'আমি নিজেই তো দেখলাম তোমরা ঘুমাচ্ছ।'

'আসলে ব্যাপারটা ঠিক তা না। আমরা আসলে একটা প্রতিযোগিতা করছিলাম।'

'প্রতিযোগিতা!'

'জি স্যার। আমরা দুজন একটা বাজি ধরেছি, কে কতক্ষণ বেঞ্চের ওপর মাথা রেখে চুপচাপ চোখ বুজে থাকতে পারে।'

'এটা কী ধরনের প্রতিযোগিতা হলো?'

'আমরা আসলে বেশি ছটফট করি তো, তাই...।' অনতু নিজের মাথা নিজেই চুলকাতে থাকে।

স্যার আর কিছু না বলে চৌকির মতো জায়গায় গিয়ে দাঁড়ান। চক দিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে সেদিনের তারিখ আর বারের নাম লিখে রোল কল করার খাতা নিয়ে নাম ডাকতে থাকেন। একে একে ১ থেকে ১২ রোল নম্বরের সবাই 'প্রেজেন্ট স্যার' বলে তাদের উপস্থিতি জানায়, কিন্তু রোল নম্বর ১৩ বলতেই অনতু আর কিছু বলে না। অনতু আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। বিটলুর রোল নম্বর ১৭, ঘুমিয়ে পড়েছে সেও।

বিটলু আর অনতু আমাদের পাশেই বসেছে, কিন্তু আমরা তো ওদের ওপর রেগে আছি। স্যার রোল করার পরও তাই ওদের আমরা ডাকিনি, ক্লাসের কেউই ডাকেনি। স্যার রোল কল বন্ধ করে সামনের দিকে তাকালেন, একটু পর খাতাটা বন্ধ করে চৌকির মতো উঁচু জায়গা থেকে নেমে এলেন। তারপর অনতু আর বিটলুর সামনে এসে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন ওদের দিকে। ওরা ঘুমাচ্ছে, নাক আর মুখ দিয়ে একটু একটু শব্দ করে ঘুমাচ্ছে।

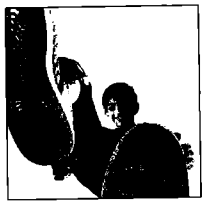

দুটো উদ্দেশ্য নিয়ে আজ রাতে বের হয়েছি আমরা। প্রথম উদ্দেশ্য—নতুন স্যার আজও রুম থেকে বের হন কি না সেটা দেখা, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে—রতনরা যদি স্কুলের বাইরে যায় আজ, তবে তারা কোথায় যায়, সেটা জানা। কাল রাতে আমরা আমাদের রুমে চলে আসার পর আরো অনেকক্ষণ বিটলু আর অনতু হাসনাহেনা গাছের আড়ালে বসে ছিল। কিন্তু স্যারকে বের হতে দেখেনি আর। তাঁকে আরেকবার দেখার আশায় ওরা স্যারদের হোস্টেল রুমের কাছে পর্যন্ত গিয়েছিল। কোনো লাভ হয়নি, রুমের দরজা বন্ধ ছিল স্যারের। একটা বিপদ অবশ্য হওয়ার আশঙ্কা ছিল। আরেক রুম থেকে বিজ্ঞান স্যার বের হয়েছিলেন। তবে তিনি নতুন স্যারের মতো হেঁটে বেড়াননি, বাথরুমে যাওয়ার জন্য বের হয়েছিলেন তিনি।

অনতু আবার অপরাধী অপরাধী চেহারা করে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্যরি বললাম না তোদের?'

'স্যরি বলছিস ঠিক আছে। কিন্তু কাল রাতে আমরা রুমে চলে এলাম আর তোরা রয়ে গেলি, এটা ভালো লাগেনি আমাদের। আমরা যে কাজ করি তা তো একসঙ্গেই করি, তাই না?' আমি বললাম।

'তা তো ঠিক। কিন্তু কেন যেন কাল সবকিছু না জানার পর রুমে ফিরতে ইচ্ছে করছিল না।' বিটলু আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল।

'সবকিছু তো আমাদেরও জানতে ইচ্ছে করছিল। নতুন স্যার কিংবা স্যারের মতো একটা লোক হেঁটে বেড়াচ্ছেন গভীর রাতে, যার গা থেকে চাদর খুলে নেওয়া হচ্ছে, তিনি তার কিছুই বুঝতে পারছেন না, এসবের সবকিছু না জেনে কে রুমে ফিরতে চায় বল। কিন্তু আমাদের এও বুঝতে হবে, আমাদের স্কুল আছে, লেখাপড়া আছে, সারা রাত বাইরে কাটালে আমাদের চলবে না।' দীর্ঘ বক্তৃতার মতো করে মৃদুল কথাটা বলে।

'আমি আবারও স্যরি।' অনতু অপরাধীর মতো বলে।

'আমিও স্যরি।' বিটলু কাঁপা কাঁপা গলায় বলে।

'ওকে, ওরা যখন এত করে স্যরি বলছে, আমাদের এখন সবকিছু ভুলে যাওয়া উচিত।' আমার আর মৃদুলের দিকে তাকিয়ে অয়ন বলে।

'ওকে।' আমি কথাটা বলেই ডান হাতটা উঁচু করি। সবাই মিলে একে একে আমার ডান হাতটাতে ওদের হাত দিয়ে গুঁতো দেয়, ক্রিকেটাররা কোনো উইকেট পেলে যেমন করে হাত উঁচু করে একে অপরের হাতে গুতো দেয় ।

'এবার আমার একটা আবেদন আছে।' মৃদুল গলাটা বেশ গম্ভীর করে বলে, 'আজ বিটলু আর অনতু যখন ক্লাসে ঘুমাচ্ছিল, তখন আমাদের নতুন স্যারকে ইশারা করে রতনরা বলে দিয়েছে। ওদের সাহস বেড়ে গেছে, আমি ওদের সাহসটা একটু কমাতে চাই।'

'শুধু কি তাই, ওরা যখন ঘুমাচ্ছিল তখন রতনরা ফিসফিস করে কথা বলে হাসছিল এবং একটু পর কিছু একটা করার জন্য ওদের দিকে এগিয়ে আসছিল।' অয়ন রাগী রাগী গলায় বলে।

'ওদের আসা দেখে আমরা অবশ্য তখন সবাই উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। তারপর আর এগিয়ে আসার সাহস পায়নি ওরা।' আমি বললাম।

'সেদিন ক্লাসে অনতুর সিগারেট খাওয়া নিয়ে রতনরা অভিনয় করেও দেখাল। দিন দিন ওরা সাহস বেশি দেখাচ্ছে। এর একটা বিহিত খুব দ্রুত করা দরকার আমাদের।' মৃদুল আগের মতো করেই বলে।

'অবশ্যই।' অয়ন কিছুটা শব্দ করে বলে।

সঙ্গে সঙ্গে বিটলু অয়নের মুখটা ঠেসে ধরে বলে, 'আস্তে, এত রাতে একটু জোরে কথা বললেই সবাই শুনতে পাবে।'

চুপচাপ বসে আছি আমরা গোপন চত্বরে। ইদানীং অনেক মশা হয়েছে। বেশ ডিসটার্ব করছে মশাগুলো। অনতু ওর নিজের গালে নিজেই একটা থাপ্পড় মেরে বলল, 'নতুন স্যার সেদিন বলেছিলেন, নেপোলিয়ন নামে কোন বীর নাকি বলেছিলেন, অসম্ভব বলে কিছু নেই। কিন্তু অসম্ভব বলে অনেক কিছু আছে। এই যে একটু আগে একটা মশা আমার গালে বসে রক্ত খেতে চাইছিল, মানুষ কি কখনো পারবে কোনো মশার গালে বসে তার রক্ত খেতে?'

'তা কী করে সম্ভব!' আমি বললাম।

'পৃথিবীতে আরো অনেক অসম্ভব আছে। এই যেমন ধর আমরা কখনোই মুখে করে আমাদের শরীরের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি ওজন বইয়ে নিয়ে যেতে পারব না, সেটা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু পিঁপড়াদের পক্ষে তা সম্ভব।' অনতু বলল।

'আরো একটা অসম্ভব ব্যাপার হচ্ছে...।' মৃদুল কথাটা বলতে নিয়েই থেমে যায়। রতনদের হোস্টেল-রুমের দিকে চোখ বড় বড় তাকায় ও। ওর তাকানো দেখে আমরাও তাকাই। প্রথমে কিছু দেখতে পাই না আমরা। একটু পরই দেখতে পাই চারটা ছেলে পা টিপে টিপে স্কুলের দেয়ালের দিকে যাচ্ছে। বেশ

দূর থেকে আমরা ব্যাপারটা দেখছি, কিন্তু আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না ওই চারটা ছেলে আর কেউ না, ওরা হচ্ছে রতন, টোটন, বাদল আর ঝন্টু।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় অনতু। কিন্তু তার আগেই ওর হাত ধরে ওকে বসিয়ে দিই আমি। তারপর ফিসফিস করে বলি, 'এত তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ানোর কী হলো। আগে দেখি না ওরা কী করে।'

বিটলুও ফিসফিস করে বলার মতো বলল, 'ওরা তো দেয়াল টপকে স্কুলের বাইরে চলে যাবে এখনই।'

'আমরাও যাব।' আমি বললাম।

'কিন্তু আমরা দেয়াল টপকানোর আগেই যদি ওরা দূরে কোথাও চলে যায়, যদি আমরা খুঁজে না পাই ওদের?' অনতু বলল।

'দূরে আর কোথায় যাবে ওরা, খুঁজে ওদের পাবই।' মৃদুল বেশ আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলে।

রতনদের রুম থেকে দেয়ালের দিকে যেতে হলে স্যারদের হোস্টেল-রুমের সামনে দিয়ে যেতে হয়। ওরা আস্তে আস্তে স্যারদের হোস্টেল-রুমের দিকে আসছে। ওরা যতই এদিকে আসছে, আমরা ততই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ওদের। হাঁটতে হাঁটতে কে যেন মাটিতে পড়ে গেল হঠাৎ। অল্প অল্প অন্ধকারের মধ্যে আমরা টের পেলাম না কে পড়ে গেল। অনতু হঠাৎ উত্তেজনা নিয়ে বলল, 'ওই দেখ!'

আমরা রতনদের দিকে তাকালাম। তেমন কিছুই বুঝতে পারলাম না। ওরা তো দিব্যি হেঁটে আসছে। তেমন কিছু তো ঘটেনি। মৃদুল একটু বিরক্ত হয়ে অনতুকে বলল, 'কী দেখব?'

'স্যারদের হোস্টেলের দিকে তাকা।'

ঝট করে আমরা একসঙ্গে স্যারদের হোস্টেল-রুমের দিকে তাকালাম। গত রাতের মতো আজও রুম থেকে বের হয়েছেন স্যার। দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন তিনি, কী মনে করে ভেতরে ঢুকে গেলেন আবার। একটু পর আবার বের হয়ে এলেন এবং সোজা হাঁটতে লাগলেন স্কুলের মাঠ বরাবর।

রতনরা এতক্ষণ খেয়াল করেনি, খেয়াল করার কথাও না। ওরা যে জায়গায় ছিল সেখান থেকে স্যারের রুমের দরজা ও বারান্দা দেখা যায় না। আরো একটু এগিয়ে এলে দেখা যাবে। কিন্তু স্যার নিজেই রুম থেকে বেরিয়ে আসার ফলে স্যারকে দেখে ফেলল ওরা। সঙ্গে সঙ্গে চারজনই থমকে দাঁড়াল এবং যত দ্রুত সম্ভব একটা আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল।

কাল যেমন স্যারকে চেনা যাচ্ছিল না, চাদর মুড়ে ছিলেন তিনি, আজও

তাঁকে চেনা যাচ্ছে না। চাদর মোড়া দিয়ে আছেন আজও। স্যারের মুখ, হাত, পা সবই চাদর দিয়ে ঢাকা। একটুও টের পাওয়া যাচ্ছে না এটা আমাদের নতুন স্যার।

আমরা এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি রতনরা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে স্যারের দিকে, কিন্তু আমরা নিশ্চিত ওরা স্যারকে চিনতে পারেনি। ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক জায়গায়। আমাদের মনে হচ্ছে ওরা কাঁপছে।

স্যার হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে রতনরা যেখানে লুকিয়ে আছে সেদিকে যেতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে রতনরা ভয়ে আরো গুটিয়ে গেল। ওদের মধ্যে বাদলটা যা ভিতু, ভয়ে আবার প্যান্টেই না প্রশ্রাব করে ফেলে।

অনতু হঠাৎ কিছুটা লাফিয়ে উঠে বলল, 'একটা আইডিয়া এসেছে মাথায়, ভয়াবহ আইডিয়া।'

বিটলু চোখ দুটো চকচক করে বলল, 'কী?'

'পরে বলছি। তার আগে আমি আমার রুম থেকে একটু ঘুরে আসি।' অনতু ঘুরে ওর রুমের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

মৃদুল দ্রুত অনতুর হাত টেনে ধরে বলল, 'এভাবে যাচ্ছিস কেন তুই! রতনরা তো দেখে ফেলতে পারে।'

'ওখান থেকে ওরা দেখতে পাবে না আমাকে।'

'তবুও সাবধানে যাওয়া উচিত।'

'ওকে।'

মাথা নিচু করে অনতু ওর রুমের দিকে হেঁটে যায়। আমরা আবার রতনদের দিকে ফিরে তাকাই। স্যার ওদের দিকেই হেঁটে যাচ্ছেন। আমরা স্পষ্ট দেখতে পেলাম, বাদল ঝন্টুকে জাপটে ধরেছে। মনে হচ্ছে, যেকোনো মুহূর্তেই চিৎকার করে উঠবে ও।

আরো কয়েক পা এগিয়ে যাওয়ার পর স্যার আবার ঘুরে দাঁড়ালেন। এবার আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন স্যার। কিন্তু আমরা তাঁর জন্য মোটেই চিন্তিত নই। কারণ আমরা তো জানি, স্যার কেবল হাঁটতেই থাকেন, অন্য কোনো কিছু খেয়াল করেন না, কিংবা খেয়াল করতে পারেন না তিনি।

স্যারের এদিকে আসা দেখে রতনরা একটু সোজা হয়ে দাঁড়ায়। আমরা টের পাচ্ছি, ওরা পা টিপে টিপে আড়াল থেকে সরে এসে ওদের রুমের দিকে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ওরা কয়েক পা এগিয়ে যায়ও, কিন্তু হঠাৎ স্যার আবার ঘুরে দাঁড়ান। সঙ্গে সঙ্গে ঝট করে প্রায় লাফ দিয়ে ওরা আড়ালে চলে যায় আবার।

স্যার আর রতনদের দিকে তাকিয়ে আছি আমরা। মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করছি সবকিছু। পেছনে হঠাৎ খচ খচ শব্দ হতেই ফিরে তাকাই আমরা। একটা ভূতের মতো কী যেন দাঁড়িয়ে আছে, অয়ন তা দেখে চিৎকার করে উঠতে নেয়। কিন্তু যেই না মুখটা হাঁ করেছে, সঙ্গে সঙ্গেই ভূতটা দ্রুত এগিয়ে এসে অয়নের মুখটা হাত দিয়ে চেপে ধরে বলে, 'ওই গাধা, চিৎকার করছিস কেন, আমি অনতু।' বলেই অনতু ওর মুখের সামনে থেকে একটা মুখোশ খুলে ফেলে। আমরা তবু অনতুর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি। ওর গায়ে কোনো শার্ট কিংবা গেঞ্জি নেই, সম্পূর্ণ খালি-গা ওর। প্যান্টও পরা নেই ওর, তবে একেবারে ন্যাংটো না, একটা নেংটির মতো ছোট্ট কাপড় পরে আছে ও। সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে, অনতুর সারা গায়ে তেল মাখা, তেলে চপচপ করছে ওর সারা শরীর। এই অন্ধকারের মাঝেও ওর গায়ে যতটুকু আলো পড়েছে, তাতেই ওকে ভূত ছাড়া আর কিছু মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে কোনো একটা পচাপানির গর্ত থেকে এখনই উঠে এসেছে এই ভূতটা।

বিটলু একটা আঙুল দিয়ে অনতুর গা ছুঁয়ে বলল, 'এভাবে এসেছিস কেন তুই?'

'কাজ আছে।'

'কী কাজ?'

'ওই যে বললাম আইডিয়া।'

'সেই আইডিয়াটা কী, তা বলবি তো!' বিটলু কিছুটা ক্ষেপে যাওয়ার মতো করে বলে।

'সেটা বলব না, তবে দেখাব।'

সামনের দিকে তাকাই আমরা। স্যার আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। তিনি এবার সোজা তাঁর রুমের দিকে যাচ্ছেন। রতনরা আবার ওদের রুমের দিকে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। তার আগেই অনতু বলল, 'চল।'

আমি বললাম, 'কোথায়?'

'আগে চলই না।' অনতু আমাদের হাত ধরে টানতে থাকে।

আর কোনো কথা বলার সুযোগ পাই না আমরা। অনতু হাঁটতে থাকে। ওর পেছন পেছন আমরাও হাঁটতে থাকি। স্কুল-মাঠের গাছের আড়াল দিয়ে, পা টিপে টিপে খুব দ্রুত আমরা রতনদের হোস্টেলের কাছে একটা মোটা গাছের পাশে গিয়ে দাঁড়াই। অনতু আমাদের এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে আরো একটু এগিয়ে যায়। তারপর সোজা গিয়ে রতনের রুমের দরজা খুলে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। টোটন আর ঝন্টু থাকে এক হোস্টেলে, বাদল থাকে আরেক হোস্টেলে, আর রতন থাকে এ হোস্টেলে। টোটন, ঝন্টু আর বাদল

যার যার হোস্টেলে চলে গেছে। কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি, রতন একা একা এগিয়ে আসছে তার রুমের দিকে। বারান্দার টিমটিমে আলোর বাতিতে অল্প অল্প দেখা যাচ্ছে তার চেহারাটা। তাতেই বোঝা যাচ্ছে বেশ ভয়ে ভয়ে আছে রতন।

রুমের একেবারে কাছে চলে এসেছে রতন। কিন্তু বারান্দায় পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়াল ও। চোখ দুটো বড় বড় করে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখল—সারা গা চকচক করা একটা ভূত বের হচ্ছে ওর রুম থেকে। রতন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, প্রচণ্ড চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় মাটিতে।

সকালে স্কুল-মাঠে এসে দেখি টোটন, রতন, ঝন্টু আর বাদল একসঙ্গে কান ধরে দাঁড়িয়ে আছে। স্কুলমাঠে এখনো সব ছাত্র এসে উপস্থিত হয়নি, স্যাররাও কেউ আসেননি। অনতু দুষ্ট দুষ্ট হাসি দিয়ে বলল, 'চল, ওদের সামনে দিয়ে একটু ঘুরে আসি।'

বিটলু রেডিই ছিল, অনতু বলার সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা লাফিয়ে উঠে বলল, 'চল, হেব্বি একটা মজা করব আজ ওদের সঙ্গে।'

'স্যাররা দেখলে কিন্তু খবর আছে।' অয়ন ভয় ভয় গলায় বলে।

'খবর থাকলে তোর যাওয়ার দরকার নেই, এখানে দাঁড়িয়ে থাক। তোকে তো এখন দুধের বোতল দিতে পারব না, তাই এখানে দাঁড়িয়ে থেকে একা একা আঙুল চোষ আর ছড়া বল।' অনতু অয়নের দিকে রাগী চোখে তাকিয়ে বলে।

'অনতু ঠিকই বলেছে। তুই মাঝে মাঝে এমনি এমনি ভয় পাস।' আমি অনতুর কাঁধে একটা হাত রেখে বলি।

'এখন রাগারাগির দরকার নেই। একটু পরই স্যাররা এসে পড়বেন। অনতু আর বিটলু ঠিকই বলেছে। চল, ওদের সামনে দিয়ে একটু চক্কর মেরে আসি।' মৃদুল কথাটা বলেই এগোতে থাকে, আমরাও ওর পেছন পেছনে এগোতে থাকি।

রতনদের সামনে গিয়ে বিটলু ফিসফিস করে বলে, 'কী রে রতইন্যা, অনতু তো সিগারেট খেয়ে ধরা পড়েছিল, তোরা কী খেয়ে ধরা পড়েছিস?'

'ওলা কত্তো বালো থেলে— ।' অনতু বাচ্চাদের মতো গলা করে কথা বলতে থাকে, 'ওলা থিগালেট খাবে কেন, ওলা খাবে দুদু। তাই না লে লতন? তা তোলা কি দুদু চুলি কলে ধলা পলেছিস, না অন্য কিছু চুলি কলে?'

ঝন্টু দাঁত কিড়মিড় করে বলে, 'অনতু ভালো হচ্ছে না কিন্তু।'

'তাই?' অনতুও দাঁত কিড়মিড় করে বলে, 'তা কী করলে ভালো হবে? বল, সেটা করে দেখাই।'

'তোদের কিছু করতে হবে না। তোরা এখন এখান থেকে যা।' টোটন রাগী রাগী গলায় বলে।

'যাব? তার আগে বল না তোরা কী খেয়ে ধরা পড়েছিস?' বিটলু আবার ওদের জিজ্ঞেস করে।

'আমরা কিছু খাইনি। তোদের বললাম না এখান থেকে চলে যেতে!' টোটন আগের চেয়ে রেগে বলে।

'তুই বললেই যেতে হবে?'

'হ্যাঁ, যেতে হবে।'

'যদি না যাই?'

রতন এবার একটু শব্দ করে বলে, 'বিটলু, তুই কিন্তু খুব বেশি কথা বলছিস।'

'তোর কোনো সমস্যা আছে তাতে?'

'দাঁড়া, স্কুল শেষে তোদের আমরা কী করি।' রতন চোখ দুটো বড় বড় করে বলে।

'ঠিক আছে, স্কুল শেষ হোক, দেখি তোরা কী করিস আমাদের।'

বিজ্ঞান স্যারকে আসতে দেখা যাচ্ছে। আমরা দ্রুত সরে আসি রতনদের সামনে থেকে। লাইনে দাঁড়ানোর কিছুক্ষণের মধ্যে আর সব স্যার চলে এলেন। ফিসফিস করে কী যেন বলছেন সবাই। এরই মধ্যে হেডস্যার এসে রতনদের পাশে দাঁড়ালেন।

সবাই একদম চুপ হয়ে আছে। কেউ কোনো রকম ফিসফাসও করছে না। সবাই অধীর আগ্রহে হেডস্যারের দিকে তাকিয়ে আছে। বেশ কিছুক্ষণ পর হেডস্যার রতনকে বললেন, 'তুমি একটু সামনে এসে দাঁড়াও।'

সামনে এসে দাঁড়াল রতন।

হেডস্যার খুব স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'কাল রাতে কী হয়েছিল, সবাইকে এবার তা বলো।'

রতন একটু ইতস্তত করে হেডস্যারের দিকে তাকায়। কিন্তু কিছু বলে না। হেডস্যার আবার বলেন, 'কী হলো, বলো?'

রতন কী একটা বলতে নেয়, তার আগেই হেডস্যার বলেন, 'যা-ই বলো, কোনো রকম মিথ্যা কথা বলবে না। তোমরা তো জানো, আমি কখনো মিথ্যা বলা পছন্দ করি না। হ্যাঁ, এবার শুরু করো।'

'কাল রাতে আমি বাথরুমে গিয়েছিলাম। বাথরুম সেরে রুমে ঢোকার আগেই দেখি একটা ভূত বের হচ্ছে আমার রুম থেকে। আমি সে ভূতটা দেখে চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে যাই।' রতন দ্রুত কথাটা বলে মাথা নিচু করে ফেলে।

রতনের কথাটা শুনে ফিক করে হেসে ফেলে অনতু। সঙ্গে সঙ্গে হেডস্যার

একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বলেন, 'হাসি দিল কে?'

হাত তুলে অনতু বলল, 'আমি ঠিক হাসি দিইনি স্যার, গলাটা কেমন যেন করছে তাই একটু শব্দ হয়েছে।'

হেডস্যার একটু সোজা হয়ে দাঁড়ান। তারপর সবার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'একটু আগে..., এই ছেলেটা...।' স্যার আবার রতনের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'কী যেন নাম তোমার...?'

'রতন।'

'হ্যাঁ, একটু আগে রতন যা বলল তা কি তোমরা বিশ্বাস কর? তোমাদের কি মনে হয় আমাদের স্কুলে কোনো ভূত বাস করে? তা ছাড়া ভূত বলে কি কিছু আছে?' হেডস্যার উত্তর পাওয়ার আশা নিয়ে তাকিয়ে থাকেন। কিন্তু কেউ কিছু বলে না।

বেশ কিছুক্ষণ সেভাবেই দাঁড়িয়ে থেকে হেডস্যার বলেন, 'কাল রাতে রতন যখন চিৎকার করে ওঠে তখন আমি স্কুলের ভেতর কেবল ঢুকেছি। তোমরা তো জানো, প্রায়ই আমি রাতে বাসা থেকে বের হয়ে স্কুলটা একবার হলেও দেখে যাই। এটা আমার অনেক দিনের অভ্যাস। তো ঢুকেই চিৎকারটা শুনে আমি প্রায় দৌড়ে চলে আসি রতনদের হোস্টেলটার কাছে। তারপর দেখি বারান্দার ওপর পড়ে আছে রতন, জ্ঞানহারা। যেই না রতনের হাত ধরেছি আমি, সঙ্গে সঙ্গে দেখি এই তিনটা ছেলে এসে উপস্থিত।' হেডস্যার ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা টোটন, ঝন্টু আর বাদলের দিকে তাকান।

অনতু আবার হাত তোলে। সঙ্গে সঙ্গে হেডস্যার বলেন, 'বলো, কী বলবে তুমি।'

'রতনের চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ করে ওরা এল কোথা থেকে স্যার?' অনতু বেশ গম্ভীর আর ভাব নিয়ে বলে।

'হ্যাঁ, সেটা আমার মাথায়ও এসেছে তখন। কিন্তু আমার বিশ্বাস, ওরা ভাবেনি দৌড়ে এসে রতনের পাশে আমাকে দেখবে। ওরা যদি একটু টের পেত রতনের আশপাশে আমি আছি, তাহলে ভুলেও রতনের কাছে আসত না।'

'একদম ঠিক বলেছেন স্যার।'

'রতনের মুখে দ্রুত পানি ঢেলে জাগিয়ে তুলে আমার রুমের বারান্দায় নিয়ে যাই ওকে, সঙ্গে ওদেরও নিয়ে যাই। তারপর রতনকে আমার রুমে নিয়ে জিজ্ঞেস করি, কেন ও রাতে বাইরে বের হয়েছিল। রতন এক কথা বলেছে, একটু পর একজন একজন করে এই তিন ছেলেকে ডেকেছি, তিনজন তিন রকমের কথা বলেছে। মোট কথা চারজন চার রকমের কথা বলেছে, তার মানে

মিথ্যা বলেছে। কিন্তু আমি তো বুঝে ফেলেছি চারজন পরিকল্পনা করে একই সময়ে রুম থেকে বের হয়েছিল।'

আবার হাত তুলল অনতু।

হেডস্যার বললেন, 'বলো?'

'চার জন চার রকমের কী বলেছে তা কি আমরা একটু জানতে পারি?' অনতু বেশ অধিকারের ভঙ্গিতে কথাটা বলে।

'রতন কী বলেছে তা তো তোমরা শুনলে। বাকি তিনজনের একজন বলেছে, তার নাকি চাঁদ খুব প্রিয়, সে চাঁদ দেখতে বের হয়েছে। আরেকজন বলেছে, তার নাকি খুব গরম লাগছিল, তাই হাওয়া খেতে বের হয়েছে। তৃতীয়জন বলল, সে এমনি এমনি বের হয়েছে। চারজনের চার রকমের কথা, মানে মিথ্যা কথা। আসলে ওরা কোনো একটা উদ্দেশ্য নিয়ে একসঙ্গে রুম থেকে বের হয়েছিল।' হেডস্যার একটু থেমে বলেন, 'তোমরা তো জানো, সাধারণত কাউকে গায়ে আঘাত করে শাস্তি দিই না আমি। এই দুষ্ট ছেলেগুলো রাতে রুম থেকে বের হয়েছে এবং মিথ্যা বলেছে, এদের শাস্তি পেতে হবে। এবার তোমরা বলো এদের আমি কী শাস্তি দেব?'

অনতু হাত তুলে বলল, 'আমাদের টয়লেটের কমোডগুলো মাঝে মাঝে বেশ নোংরা হয়ে থাকে। আমরা এক বছর ওদের দিয়ে টয়লেটের কমোডগুলো পরিষ্কার করতে পারি।'

'সেটা কি ঠিক হবে?' হেডস্যার বলেন।

'তা না হলে আমরা ওদের গলায় জুতোর মালা পরিয়ে সারা স্কুল ঘোরাতে পারি।' বাদল বেশ আনন্দ নিয়ে কথাটা বলে।

'এটা কী বললে তুমি! এসব তো চোরদের করা হয়।' হেডস্যারের এটাও পছন্দ হয় না।

'এটা করলে কেমন হয়— ।' অয়ন কাঁপা কাঁপা গলায় বলে, 'ওদের হাত পা বেঁধে আমরা গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখলাম পুরো এক দিন।'

'না, এটাও করা যাবে না। এটা খুব খারাপ শাস্তি।' হেডস্যার অন্য ক্লাসের ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'কেবল তো ক্লাস সেভেনের ছেলেগুলোই বলছে, তোমরাও কিছু বলো।'

কেউ কিছু বলে না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে সবাই। এমন সময় মৃদুল হাত তুলে বলে, 'আমি কি কিছু বলব স্যার?'

হেডস্যার মৃদুলের দিকে তাকিয়ে বলে, 'না, তুমিও তো ক্লাস সেভেনের, অন্য ক্লাসের কেউ বলুক।'

হেডস্যার অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেন, কিন্তু সবাই আগের মতোই চুপচাপ।

এটা লক্ষ করে স্যার বলেন, 'তাহলে আমিই বলি। প্রতিদিন ভোরে আমাদের বড় স্কুল-রুমটা যে ঝাড় দেয়, আগামী সাত দিন সে অন্য কাজ করবে। এ সাত দিন স্কুল-রুমটা প্রতিদিন ভোরে ঝাড় দেবে এ দুষ্ট চারজন।' হেডস্যার সবার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'কী, কেমন হলো শাস্তিটা—খারাপ, না ভালো?'

'খুব বেশি ভালো হলো না স্যার।' অনতু মন খারাপ করার ভঙ্গি, কথাটা বলে রতনদের দিকে তাকায়। রতন, টোটন, ঝন্টু আর বাদলও তাকিয়ে আছে অনতুর দিকে। কিন্তু ওদের বড় বড় চোখ দেখে মনে হচ্ছে, এ মুহূর্তে অনতুকে ওরা একা পেলে সোজা পানি দিয়ে গিলে ফেলবে কিংবা দাঁত দিয়ে কামড়ে খেয়ে ফেলবে ওর মাথা থেকে পা পর্যন্ত। তাতে খুব বেশি সময় লাগবে না ওদের, মাত্র এক থেকে পাঁচ মিনিটেই শেষ করে ফেলবে সবকিছু।

খুব গম্ভীর হয়ে ক্লাসে ঢুকলেন আমাদের নতুন স্যার। সাধারণত হাসি হাসি মুখ করে ক্লাসে ঢোকেন তিনি, কিন্তু আজ অন্য রকম লাগছে তাকে। কোনো কথাও বলছেন না তিনি কারো সঙ্গে। অনতু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'স্যার, একটা কথা বলব?'

স্যার গম্ভীর হয়েই বললেন, 'বলো।'

'আপনার কি মন খারাপ?'

'আজ সকালে যা ঘটে গেল তার জন্য কি মন ভালো থাকার কোনো কারণ আছে?' স্যার মনটা খুব খারাপ করে বলেন, 'টোটন-রতনরা কেন যে রাত করে বাইরে বের হয়েছিল?'

'আমরা যতদূর জানি, বেশি রাতে মানুষজন আসলে ভালো কোনো কাজে বাইরে বের হয় না।' অনতু বড় মানুষদের মতো গম্ভীর হয়ে বলে।

'তোমার কি মনে হয় ওরা কোনো খারাপ করার জন্য জন্য বাইরে বের হয়েছিল?' স্যার অনতুকে জিজ্ঞেস করেন।

'সেটা তো আমি বলতে পারব না। তবে একটা কথা আছে না—চোরের দশ দিন গৃহস্থের একদিন। ওরা হয়তো অনেক দিন ধরেই রাত করে রুম থেকে বের হয়, কিন্তু ধরা পড়ল কাল রাতে। এ সবই ভাগ্য।' জিহ্বা চুকচুক শব্দ করে অনতু।

অনতুর দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে ফেলে বিটলু। অনতু এমনভাবে কথা বলছে, যেন একজন বড় মানুষ কথা বলছে। বিটলুর হাসা দেখে অনতু চোখ বড় করে একবার ওর দিকে তাকাল, যেন ওর এ রকম হাসি দেখে কেউ কোনো সন্দেহ না করে ফেলে। বিটলু তবু মিটিমিটি হাসতে লাগল।

স্যার রোল কল করার খাতাটা টেবিলের ওপর ছুড়ে ফেলে দেওয়ার মতো

করে রেখে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন একটু। তারপর সবার দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকালেন। বেশ কিছুক্ষণ সেভাবেই তাকিয়ে থাকার পর বললেন, 'তোমাদের কিছু কথা বলব আজ আমি।' স্যার রতনের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'রতন, তুমি কি বলবে তোমরা কেন রাতে রুম থেকে বের হয়েছিলে?'

বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়ায় রতন, কিন্তু কিছু বলে না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

স্যার আবার বলেন, 'বলবে না?'

রতন এবারও কিছু বলে না।

স্যার তাই দেখে বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি বসো।' স্যার রতনের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বলেন, 'তোমরা বরং রাতে রুম থেকে বের না হয়ে খুব ভোরে বের হতো পার। এতে তোমাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে...।'

কথাটা শেষ করতে পারেন না স্যার, তার আগেই অনতু বলে, 'স্বাস্থ্য ভালো থাকবে মানে কী স্যার, সকালে উঠলে আমাদের স্বাস্থ্য কি ফার্মের মুরগি মতো নাদুসনুদুস হবে, না সুমনের মতো ভোম্বল ভোম্বল হবে?'

'ভালো স্বাস্থ্য মানে নাদুসনুদুস স্বাস্থ্য না, ভোম্বল ভোম্বলও না। ভালো স্বাস্থ্য মানে যে স্বাস্থ্যে কোনো রোগ-বালাই থাকে না। ভোরে ঘুম থেকে ওঠা নিয়ে তোমাদের একটা সত্য গল্প বলি। ক্লাস নাইনে পড়ার সময় আমার এক বন্ধু ছিল। প্রতিদিন ভোরে উঠে রাস্তায় দৌড়াতে যেত সে। একদিন দৌড়াতে দৌড়াতে সে দেখে রাস্তার পাশে একটা মানিব্যাগ পড়ে আছে, তার মধ্যে অনেকগুলো টাকা। দেখলে তো, ভোরে উঠলে জীবনে অনেক উন্নতি হয়।'

অনতু বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'কিন্তু স্যার, যার মানিব্যাগটা রাস্তায় পড়ে ছিল, সে তো আরো ভোরে ঘুম থেকে উঠে রাস্তায় বের হয়েছিল। এখানে তো তার কোনো উন্নতি হলো না, বরং ক্ষতি হলো।'

স্যার অনতুর দিকে কেমন করে যেন তাকালেন। স্যারকে দেখে মনে হচ্ছে, তিনি অনতুর কথা বুঝতে পারছেন না, একেবারেই বুঝতে পারছেন না। কিছুক্ষণ অবাক হয়ে অনতুর দিকে তাকিয়ে স্যার আবার বললেন, 'তোমাদের একটা সাধারণ প্রশ্ন করি। বলো তো, সাদা মুরগি ভালো, না কালো মুরগি ভালো?'

অনতু আবার উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'কোন ধরনের মুরগি স্যার, দেশি। না ফার্মের মুরগি?'

'দেশি কিংবা ফার্মের মুরগি বলে কথা নেই। তুমি শুধু বলো, সাদা মুরগি ভালো, না কালো মুরগি ভালো?'

অনতু জবাব দেওয়ার আগেই রতন উঠে দাঁড়িয়ে একটু শব্দ করে বলে,

'সাদা মুরগি স্যার।'

স্যার রতনের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'তোমার কাছে কেন সাদা মুরগি ভালো মনে হলো?'

'সাদা মুরগি দেখতে সুন্দর লাগে, তাই।'

হাত উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে অনতু। স্যার ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অনতু বলো।'

'আমার কাছে কালো মুরগি ভালো।'

'কালো মুরগি কেন ভালো?'

'কারণ কালো মুরগি সাদা ডিম পাড়তে পারে, কিন্তু সাদা মুরগি কখনো কালো ডিম পাড়তে পারে না।'

স্যার আবার অবাক হয়ে অনতুর দিকে তাকান। কিন্তু কোনো কিছু বলেন না। স্যারের মুখের দিকে তাকালাম আমি। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে খুব মুগ্ধ হয়ে গেছেন তিনি অনতুর কথা শুনে।

টেবিলে হাত রেখে স্যার চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন। রোল কল করার কথাও ভুলে গেছেন তিনি। বেশ কিছুক্ষণ পর তিনি শব্দ করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'আজ রোল কল ক্লাস শেষে করব আমি। তার আগে তোমাদের একটা রচনা লিখতে দেব। খুব বড় করে লিখতে হবে না, দশ মিনিটের মধ্যে লেখাটা শেষ করবে তোমরা।'

'কী নিয়ে রচনা লিখব আমরা।' অনতু জিজ্ঞেস করে।

'এক কোটি টাকা পেলে তুমি কী করবে—এটা নিয়ে তোমরা একটা রচনা লিখো। সময় মাত্র দশ মিনিট।' কথাটা বলেই স্যার রোল কলের খাতাটা হাতে নিয়ে চেয়ারে বসলেন।

আমরা নিজ নিজ খাতা বের করে রচনা লিখতে শুরু করলাম। ঠিক দশ মিনিট পর স্যার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'সময় শেষ, তোমরা যার যার সামনে খাতাটা মেলে ধরে রাখো। আমি প্রত্যেকের সামনে গিয়ে প্রত্যেকের খাতা দেখব।'

স্যার সামনের বেঞ্চ থেকে সবার খাতা দেখে আসছেন এবং বিভিন্ন রকমের মন্তব্য করছেন। এর মধ্যে সুমন খুব মজার একটা কথা লিখেছে। স্যার ওর খাতাটা হাতে নিয়ে পড়ে শোনালেন তা। সুমন লিখেছে—যদি আমি এক কোটি টাকা পাই, তাহলে প্রতিদিন শুধু দুধ দিয়ে পাউরুটি খাব। আর কিছুই খাব না।

সুমনের দিকে তাকিয়ে স্যার হাসতে হাসতে বললেন, 'দুধ দিয়ে তোমার খুব পাউরুটি খেতে ইচ্ছে করছে?'

লজ্জামাখা হাসি দিয়ে সুমন বলে, 'অনেক দিন খাই না তো। ছুটিতে বাসায় গেলে আমি তো শুধু দুধ আর পাউরুটিই খাই।'

বিটলু হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'হ্যাঁ, এখন বুঝতে পারছি, সুমনের চেহারাটা কেন পাউরুটির মতো ফোলা ফোলা।'

অনতু সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'স্যার, একটা কথা বলব?'

'বলো।'

'আমরা কি এখন থেকে সুমনকে আগের নামে না ডেকে নতুন নামে ডাকতে পারি?'

'আগে ওকে কী নামে ডাকতে?'

'ফার্মের মুরগি।'

স্যার খুক করে একটু হাসতে নিয়েই মুখে হাত চাপা দিয়ে থেমে যান। তারপর অনতুর দিকে তাকিয়ে বলেন, 'এখন কী নামে ডাকতে চাও?'

'পাউরুটি সুমন।'

স্যার সুমনের পাউরুটির মতো ফোলা ফোলা শরীরের দিকে তাকিয়ে আবার হেসে ফেলার চেষ্টা করেন। কিন্তু আগের মতোই তিনি মুখে হাত দিয়ে নিজেকে সংযত করেন। স্যার আরো কয়েকজনের খাতা দেখে অনতুর সামনে এসে দাঁড়ান। তারপর অনতুর খাতাটা হাতে নিয়ে অবাক হয়ে বলেন, 'তুমি তো কিছুই লেখনি অনতু!'

'আমার তো কোনো কিছু লেখার প্রয়োজন নেই স্যার।'

'মানে!'

'মানে খুব সহজ স্যার। এক কোটি টাকা পেলে আমি কী করব, আমি খাতায় কোনো কিছু না লেখে তা-ই বোঝাতে চেয়েছি। স্যার, এবার আপনিই বলুন, কারো কাছে কোটি টাকা থাকলে কি আর কিছু করতে হয়?'

স্যার অনেকক্ষণ অনতুর দিকে তাকিয়ে থেকে বলেন, 'অনতু, তোমার রোল নম্বর তো ১৩, না?'

'জি স্যার।'

'তোমার মাথায় যে বুদ্ধি, তাতে তো আরো ভালো রেজাল্ট করার কথা তোমার।'

'রেজাল্ট ভালো করে কী হবে স্যার? চাল-ডাল-মাছ তো সেই কিনেই খেতে হবে। তার জন্য আমাকে কাজ করতে হবে, পরিশ্রম করতে হবে। যদি এমন হতো, ফার্স্ট-সেকেন্ড হলে সবকিছু ফ্রি পাওয়া যাবে, তাহলে চেষ্টা করতাম।'

'ক্লাস সেভেনে থাকতে আমার রোল নম্বরও ১৩ ছিল।'

'তাই নাকি স্যার! আপনি তো তাহলে আমার মতোই মহা গবেট ছাত্র ছিলেন।'

'কিন্তু পরের বছরই আমার রোল হয়েছিল পাঁচ। ক্লাস নাইনে ওঠার সময় সে রোল করেছিলাম এক।'

'থ্যাংক ইউ স্যার।'

'তোমার ইচ্ছে হয় না তোমার রোল নম্বর এক হোক?'

'না।'

'কেন?'

হাসিখুশি মুখটা হঠাৎ গম্ভীর করে ফেলে অনতু। তারপর মাথাটা নিচু করে মন খারাপ করে বলে, 'কেন আমার রোল নম্বর এক করতে ইচ্ছে করে না সেটা আমি জানি, কিন্তু কখনো বলতে ইচ্ছে করে না তা, কখনোই না।'

বিকট একটা চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল আমার। সঙ্গে সঙ্গে বিছানায় উঠে বসি আমি। রাত, ঘুটঘুটে অন্ধকার চারদিকে, কিছুই দেখা যাচ্ছে না আশপাশের। প্রথমেই তাই বুঝতে চেষ্টা করি চিৎকারটা কোথা থেকে এলো। একটু পরেই বুঝতে পারি, একটা চিৎকার না, অনেকগুলো মানুষ কথা বলছে, মাঝে মাঝে দু-একজন শব্দ করেও কথা বলছে। শব্দগুলো স্কুলের মাঠের দিক থেকে আসছে।

দ্রুত রুমের বাইরে আসার জন্য বিছানা থেকে নামতেই বিটলু দৌড়ে এসে আমার রুমে ঢুকে বলে, 'খবর শুনেছিস, একটা চোর নাকি ঢুকেছে আমাদের স্কুলে!'

'তাই নাকি! কে দেখেছে চোরটাকে?'

'হেডস্যার।'

'কীভাবে দেখলেন তিনি?'

'স্কুলের ভেতর ঘুরেফিরে দেখছিলেন হেডস্যার। হঠাৎ তিনি দেখেন, আমাদের ডাইনিং হলের ভেতর থেকে কে যেন বের হয়ে আসছে।'

'কে বের হয়ে আসছিল?' আমি বললাম।

'স্যার মনে করেছিলেন আমাদের তিনজন যে বাবুর্চি আছেন, তাদের কেউ একজন হবে। একটু পর তিনি খেয়াল করেন, না, বাবুর্চিদের কেউ না। লোকটা ডাইনিং হল থেকে বের হয়ে চুপি চুপি আমাদের কিচেনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।'

'তারপর?'

'তারপর স্যার একটা গাছের আড়ালে দ্রুত লুকিয়ে পড়েন, এরপর দেখেন, লোকটা কিচেনের তালা ভাঙার চেষ্টা করছে। সঙ্গে সঙ্গে স্যার বুঝে যান, লোকটা আসলে কেউ না, একটা চোর ঢুকেছে আমাদের স্কুলে।'

'আমাদের নতুন স্যারকে দেখেননি তো?'

'তাকে দেখবেন কেন?'

'স্যার তো রাত করে ঘুরে বেড়ান, আমরা দেখেছি না!'

'না, ওই লোকটা নতুন স্যার ছিলেন না। হেডস্যার চোর চোর বলে চিৎকার

করতেই লোকটা পালিয়ে গেছে, কিন্তু নতুন স্যার তো স্কুলের মাঠে দাঁড়িয়ে হেডস্যারের সঙ্গে কথা বলছেন এখন।'

'বলিস কি, স্যাররা সবাই বাইরে নাকি!'

'শুধু স্যাররা না, অনেক ছাত্রও রুম থেকে বের হয়ে এসেছে।'

'ওরা বাইরে এসে কী করছে?'

'কেন, চোরকে খুঁজছে!'

'চোর না পালিয়ে গেছে।'

'কিন্তু হেডস্যার বলছেন চোর ঠিক পালিয়ে যায়নি, স্কুলের ভেতরই কোথাও লুকিয়ে আছে।'

'তাই নাকি!' আমি রুম থেকে বের হতে হতে বলি, 'তাহলে আমরা এখানে বসে আছি কেন, চল না আমরাও খুঁজতে থাকি।'

রুমের বারান্দায় দাঁড়িয়ে বিটলু বলে, 'মৃদুল, অয়ন আর অনতু কিন্তু খোঁজা শুরু করেছে। আমাকে বলল তোকে ডেকে আনতে, তাই তো তোর এখানে এসেছি।'

'বলিস কি! ওরা এখন কোথায় আছে?'

'সম্ভবত গোপন চত্বরের কাছে আছে, তোকে তো সেখানেই নিয়ে যেতে বলেছে।'

'তাহলে চল।' হাঁটতে হাঁটতে আমি বলি, 'এত বড় স্কুলের ভেতর চোরকে খুঁজে পাওয়া যাবে নাকি?'

'আমারও সেটা মনে হয়, চোরকে খুঁজে পাওয়া সহজ হবে না।'

গোপন চত্বরের কাছে এসে দেখি অনতু, মৃদুল আর অয়ন জরুরি মিটিং করার মতো কী যেন করছে গোপন চত্বরের পাশে বসে। আমাদের দেখেই ওরা উঠে দাঁড়াল। মৃদুল সবাইকে কাছে ডেকে ফিসফিস করে বলল, 'আমরা দুভাগ হয়ে চোরকে খুঁজব, না পাঁচজন একসঙ্গে খুঁজব?'

'দু ভাগ হয়ে খোঁজার দরকার কী, একসঙ্গেই খুঁজি।' আমি বললাম।

'আমারও মনে হয় একসঙ্গে খোঁজা ভালো।' অনতু বলল।

'আচ্ছা, রতনরা খুঁজতে বের হয়েছে নাকি?'

'ওদের একবার দেখেছি। ওরাও চোরকে খোঁজার জন্য এদিক-ওদিক ঘুরছিল।' বিটলু বলল।

কাল বিকেলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আজ রাতে বাইরে বের হব না আমরা। শাস্তি হিসেবে গতকাল হেডস্যার রতনদের যে বড় স্কুল-রুমটা ঝাড় দিতে বলেছেন সাত দিন, ভোরে ঘুম থেকে উঠে সেটা দেখব আর খ্যাপাব ওদের। কিন্তু বের আমাদের হতেই হলো।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা আমাদের লাইব্রেরির পেছনে চলে এলাম। এখানে বেশ অন্ধকার। কোনো কিছুই ভালোমতো দেখা যাচ্ছে না। অয়ন হঠাৎ ফিসফিস করে বলল, 'চোরটা তো দেয়াল টপকে বাইরে যেতে পারে। এতক্ষণ হয়তো বাইরে চলেও গেছে।'

'না, যায়নি। কারণ স্কুলের ভেতর থেকে বাইরে যাওয়ার একটাই রাস্তা, যেখান দিয়ে রাতে আমরা বাইরে যাই। কিন্তু চোরটাকে দেখেই হেডস্যার নাকি দ্রুত সেই জায়গাতে গিয়েছিলেন। আমরা যে গাছ বেয়ে দেয়ালে উঠি, দাঁড়িয়ে ছিলেন সে গাছের গোড়ায়। একটু আগে আমাদের নাইটগার্ড আঙ্কেলকে সেখানে রেখে স্যার সারা স্কুল ঘুরে ঘুরে চোরকে খুঁজেছেন।' বিটলু বলল।

'ওখানে ছাড়া তো আর কোনো জায়গা থেকে স্কুলের দেয়ালে ওঠা যায় না। আমার তো মনে হয় চোরটা তাহলে স্কুলের ভেতরই আছে।' মৃদুল বলল।

'আবার নাও থাকতে পারে। চোরেরা যে-কোনো জায়গায় দ্রুত লাফিয়ে উঠতে পারে। জান বাঁচাতে যেখানে খুশি সেখান থেকে লাফ দিতে পারে।' অয়ন বলল।

'কিন্তু চোরেরা যতই যেখানে খুশি সেখানে উঠতে পারুক না কেন, যেখান থেকে খুশি লাফ দিতে পারুক না কেন, ওই জায়গাটা ছাড়া আমাদের স্কুলের দেয়ালে ওঠার আর কোনো জায়গা নেই, আর লাফ দেওয়ার তো প্রশ্নই আসে না।' অনতু বেশ জোর দিয়ে বলল।

'রাইট, আমারও তা-ই মনে হয়।' বিটলু বলল।

লাইব্রেরির পেছন দিকটা বেশ কিছুক্ষণ ভালো করে দেখে আমরা অন্য দিকে চলে গেলাম। আমাদের এবারের টার্গেট আমাদের ব্যায়াম করার বিল্ডিংয়ের আশপাশটা। ওই বিল্ডিংয়ের পাশে বেশ কিছু বড় বড় ফুলগাছের জঙ্গল আছে। যাওয়ার সময় হঠাৎ হেডস্যারের সঙ্গে দেখা। হেডস্যার হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'খুব ভালো করে দেখো তোমরা। চোরটা স্কুলের ভেতরেই আছে, যে-কোনো মূল্যেই হোক তাকে খুঁজে বের করতে হবে।'

স্কুলের মাঠের কাছে এসে দেখি, বেশ কিছু ছাত্র স্কুলের মাঠে দাঁড়িয়ে কী যেন বলাবলি করছে। কেউ কেউ এদিক-ওদিক দৌড়ে যাচ্ছে, কে যেন জামগাছের ডালে বসে চারদিকটা দেখার চেষ্টা করছে, অনেক স্যার বেশ ব্যস্ত তার ভঙ্গিতে পায়চারি করছেন।

হঠাৎ রতন আর ঝন্টুর সঙ্গে দেখা। দৌড়ে ওরা কোথায় যেন যাচ্ছিল। অনতু দ্রুত সামনে দাঁড়িয়ে ওদের থামিয়ে দিয়ে বলল, 'এত দৌড়াদৌড়ি করছিল কেন, যা ঘুমাতে যা। সকালে উঠে তো আবার বড় স্কুলরুমটা ঝাড়

দিতে হবে তোদের।'

রতন কিছু বলল না, ঝন্টুও বলল না। ওরা অনতুর দিকে একবার রাগী চোখে তাকিয়ে দৌড়ে চলে গেল আবার।

ব্যায়াম করার বিল্ডিংয়ের পাশে এসে দেখি, বেশ কয়েকজন ছাত্র এখানে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিয়েছে। ওদের সঙ্গে আমাদের নতুন স্যারও আছেন। স্যার আমাদের দেখে এগিয়ে এসে বললেন, 'তোমারাও খুঁজে দেখছ নাকি চোরটাকে?'

'জি স্যার।'

'ভালো, খুব ভালো।' স্যার একটু হতাশার স্বরে বললেন, 'তবে অনেক ছাত্রকে অলস দেখলাম। স্কুলে চোর ঢুকেছে শুনেও রুম থেকে বের হয়নি তারা।'

অনতু একটু আগ্রহ নিয়ে বলে, 'তাই নাকি!'

'অলসতার কথা শুনে অবাক হলে বোধহয়?'

'জি।'

'তোমাদের ক্লাসে কোনো অলস ছাত্র নেই?'

'কই, দেখিনি তো!'

'নিশ্চয়ই দেখেছ। রচনা কিংবা অন্য কিছু লিখতে বললে তোমরা যখন লিখতে থাকো, ক্লাসে তখন কেউ না কেউ তো অবশ্যই চুপচাপ বসে থাকে। আর যে বসে থাকে সে-ই হচ্ছে অলস? এবার বলো তো দেখি, কে চুপচাপ বসে থাকে?' স্যার অনতুর দিকে তাকিয়ে বলেন।

অনতু দ্রুত উত্তর দেয়, 'ক্লাস টিচার।'

স্যার অনতুর দিকে এমনভাবে তাকালেন, যেন এত অবাক করা কথা তিনি কোনো দিন শোনেননি। তিনি তারপর কী একটা কথা বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই অনতু আবার বলল, 'স্যার, এখন কথা বলার সময় নেই। এদিকটায় যেহেতু সবাই দেখছে, আমরা অন্য দিকে দেখি।'

রতনদের হোস্টেল-রুমের পাশে একটা ভাঙামতো ঘর আছে। কোনো ক্লাসের চেয়ার কিংবা টেবিল ভেঙে গেল সেখানে রাখা হয় সাধারণত। ভাঙা চেয়ার-টেবিলের স্তূপ সেখানে। আমরা দ্রুত সেখানে পৌঁছেই ভালো করে দেখতে লাগলাম চারপাশটা, বেশ অন্ধকার এ জায়গাটা, ভালো করে দেখা যাচ্ছে না কোনো কিছু। বিটলু ঘরের ভেতর ঢুকে ভাঙা চেয়ার-টেবিল সরিয়ে দেখতে লাগল। অনেকক্ষণ দেখার পর ও হতাশ হয়ে বলল, 'না, শালার চোর এখানেও নেই।'

সবাই যখন অন্য জায়গায় যাওয়ার জন্য ঘর থেকে বের হচ্ছিলাম, অনতু

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে মৃদুল বলল, 'কী হলো, দাঁড়িয়ে পড়লি কেন?'

কিছু বলল না অনতু। ঘুরে দাঁড়াল আবার। আমরাও ঘুরে দাঁড়ালাম। অনতু দ্রুত আবার ঘরের ভেতর ঢুকে লাফিয়ে লাফিয়ে সোজা চলে গেল একেবারে কোনার দিকে। তারপর দু-তিনটা ভাঙা চেয়ার-টেবিল সরিয়ে মাথাটা নিচু করে প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'আপনি যে-ই হন না কেন, ওখানে থেকে বের হয়ে আসুন।'

চোখ বড় হয়ে গেল আমাদের। অনতু কাকে কী বলছে! বিটলু কিছু একটা বলার চেষ্টা করছিল, কিন্তু তার আগেই হাত দিয়ে ইশারা করে ওকে থামিয়ে দিল অনতু। তারপর মাথাটা নিচু করে আবার বলল, 'আপনাকে বললাম না ওখান থেকে বের হেয় আসতে! বের হয়ে আসুন বলছি!'

গভীর আগ্রহ নিয়ে আমরা তাকিয়ে আছি। কিন্তু কেউ বের হয়ে আসে না। অনতু যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে আমরা কেউ যেতে পারছি না, কারণ ওই জায়গাটায় কেবল একজন দাঁড়াতে পারে, আর একজন দাঁড়ালেই ভাঙা চেয়ার-টেবিল পড়ে যাবে ঝুরঝুর করে। বিটলু একবার চেষ্টা করতে নিয়েই পরে আর চেষ্টা করেনি। অনতু এবার একটু ধমক দিয়ে বলে, 'কী বললাম, বের হচ্ছেন নো কেন আপনি! বের না হলে কিন্তু স্কুলের সবাইকে ডেকে আনব এখানে।'

একটু সোজা হয়ে দাঁড়াল অনতু। আমরা ওর পাশে দাঁড়িয়ে মাথা কাত করে দেখলাম একটা মানুষ বের হয়ে আসছে ভাঙা চেয়ার-টেবিলের নিচ থেকে। মানুষটা যখন সম্পূর্ণ বের হয়ে এলো, ঘরের এই অল্প আলোতেও চমকে উঠলাম আমরা। একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের সামনে, ঠিক আমাদেরই বয়সী।

বিটলু একটু এগিয়ে গিয়ে বলল, 'কে তুমি?'

'আমার নাম বাবলু।'

'বাবলু, তুমি আমাদের স্কুলের ভেতর ঢুকেছ কেন?'

'খিদা লাইগছে তো।'

'তুমি ভাতের জন্য আমাদের স্কুলে ঢুকেছ?' পাশ থেকে মৃদুল কিছুটা ফিসফিস করে বলল।

কিছু না-বলে মাথা উঁচু-নিচু করল বাবলু। অয়ন মৃদুলের পাশে এসে বলল, 'ওখান থেকে বের হয়ে এসো বাবলু।'

আমরা সবাই সরে দাঁড়ালাম। আস্তে আস্তে ভাঙা জিনিসপত্রের ভেতর থেকে বাবলু বেরিয়ে এসে আমাদের সামনে দাঁড়াল। ভালো করে এবার আমরা ওর দিকে তাকালাম। মুখটা কেমন যেন শুকনো শুকনো লাগছে

বাবলুর। হাতে একটা স্টিলের থালা, কিন্তু পায়ের দিকে তাকাতেই চমকে উঠলাম আমরা আবার। বাবলুর ডান পায়ের গোড়ালির নিচের অংশটুকু নেই, ছোট্ট টেনিস বলের মতো গোল দেখা যাচ্ছে জায়গাটা। আমি সেদিকে তাকিয়ে বললাম, 'তোমার পায়ের এ অবস্থা কেন বাবলু?'

'জন্ম থেকেই এ রকম।'

আশপাশে হঠাৎ শোরগোল শুনতেই অনতু বলল, 'এদিকে কেউ বোধহয় আসছে। তোরা বাইরে গিয়ে দাঁড়া, কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে বলবি, এখানে কেউ নেই।'

আমরা বাইরে এসে দাঁড়ালাম। কয়েকজন ছাত্র এদিকে না এসে ওদিক দিয়ে চলে গেল। একটু পর অনতুও বের হয়ে এলো। তারপর বলল, 'বাবলুকে আমাদের রক্ষা করতে হবে। ওকে ধরিয়ে দেওয়া যাবে না, পালাতে সাহায্য করব আমরা।'

আমরা চারজন প্রায় একসঙ্গে বললাম, 'আমরাও তা-ই ভাবছিলাম।'

পাঁচজন গোল হয়ে হাঁটছি আমরা, আমাদের মাঝখানে বাবলু। আমরা যে জায়গা দিয়ে দেয়াল টপকে স্কুলের বাইরে যাই, তার একটু আগে এসে থেমে গেলাম আমরা। অনতু বলল, 'ওখানে নাইটগার্ড আঙ্কেল আছে, আমি তাকে দু-তিন মিনিটের জন্য একটু সরিয়ে নিয়ে যাব, এই ফাঁকে তোরা বাবলুকে স্কুলের বাইরে পাঠিয়ে দিবি।'

কথাটা বলেই অনতু দ্রুত চলে গেল। একটু পর আমরা দেখতে পেলাম অনতু নাইটগার্ড আঙ্কেলকে কী যেন বলে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল। আর একটুও দেরি না করে আমরা বাবলুকে সঙ্গে নিয়ে ওই জায়গাটায় চলে এলাম। তারপর চারজন ধরাধরি করে প্রথমে তুলে দিলাম গাছে, এরপর তুলে দিলাম দেয়ালের ওপর। একটু পর আমরা দেয়ালে ওপাশে ধপাস করে একটা শব্দ শুনলাম। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে মনটা ভরে গেল আমাদের।

আমাদের সবার মুখ হাসি হাসি। একটু ভালো করে খেয়াল করতেই দেখি, অনতু হাসছে না, ওর চোখ দুটো ছলছল করছে। চুপিচুপি ও কাঁদছে!

সকালে স্কুলের মাঠ থেকে এসে আমাদের কারোই আজ ক্লাস করতে ইচ্ছে করছে না। কেন যেন ভালো লাগছে না আমাদের। ভালো না লাগার কারণ অবশ্য একটা আছে, অনতু নেই আমাদের সঙ্গে। আমি ওর হোস্টেল-রুমেও গিয়েছিলাম, পাইনি ওকে, কেউ বলতেও পারে না ও কোথায় গেছে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি আমরা মাঠে। বিটলু হঠাৎ একটু সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলল, 'দুটো ব্যাপার কিন্তু আমরা এখনো বুঝতে পারছি না, ব্যাপার দুটো আমাদের জানা দরকার।'

মৃদুল আগ্রহ নিয়ে বলল, 'কোন ব্যাপার দুটো?'

'এক. রতনরা রাতে স্কুলের বাইরে গিয়ে কী করে, দুই. নতুন স্যার কেন রাতে ঘুরে বেড়ান।'

'আরো একটা ব্যাপার আছে।' আমি সবার দিকে তাকিয়ে বলি।

অয়ন আমার দিকে এগিয়ে এসে বলে, 'কোন ব্যাপার?'

'অনতুকে খুব বেশি ভালোবাসেন হেডস্যার, আমার মনে হয় এর মধ্যে কোনো কারণ আছে।'

'নাও থাকতে পারে। কোনো কোনো স্যার আছেন না, কোনো কোনো ছাত্রকে একটু বেশি ভালোবাসেন?' বিটলু বলে।

'কিন্তু আমার কাছে এ ব্যাপারটা একটু অন্য রকম লাগছে, অন্য কোনো ব্যাপার থাকতে পারে।'

মৃদুল ঠোঁট উল্টিয়ে বলে, 'কী জানি, থাকতেও পারে।'

বিটলু স্কুলের গেটের দিকে তাকিয়ে কিছুটা শব্দ করে বলে, 'ওই যে, স্কুলের গেট দিয়ে অনতু ঢুকছে।'

মাথা নিচু করে অনতু এদিকে আসছে। আমরা ওর দিকে একটু এগিয়ে গেলাম। অনতু আমাদের কাছাকছি আসতেই মৃদুল ওর একটা হাত চেপে ধরে বলল, 'কোথায় গিয়েছিলি তুই?'

'বাইরে।' অনতু ছোট্ট করে উত্তর দেয়।

'কেন?'

'এমনি।'

বিটলু এবার অনতুর কাঁধে হাত রেখে বলে, 'এমনি তো তুই কখনো বাইরে যাস না, নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে।'

'কালকের ছেলেটাকে খুঁজতে গিয়েছিলাম।'

'কোন ছেলেটা?'

'ওই যে কাল রাতের ছেলেটা।'

'অ, চোর ছেলেটার কথা বলছিস?' অয়ন বলে।

'কাউকে চোর বললে আমার খুব খারাপ লাগে। কেউ কি কখনো এমনি এমনি চোর হয়?' অনতু খুব মন-খারাপ করে বলে।

'তা ছেলেটিকে পেয়েছিস?' আমি জিজ্ঞেস করি অনতুকে।

অনতু শব্দ করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, 'না।'

বিটলু হঠাৎ একটু উত্তেজনা নিয়ে বলে, 'আচ্ছা, কাল রাতে ওই ছেলেটা এতগুলো ভাঙা চেয়ার-টেবিলের নিচে লুকিয়ে ছিল, তুই ওকে দেখলি কীভাবে বল তো?'

'প্রথমে তো দেখতে পাই নাই, এমনকি বুঝতেও পারি নাই। যখন চলে আসব ঠিক তখনই চকচকে একটা জিনিস চোখ পড়ে আমার। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা টের পেয়ে যাই আমি।'

'চকচকে জিনিসটা কী?'

'ছেলেটার হাতে একটা স্টিলের প্লেট ছিল না, ওইটা। চেয়ার-টেবিলের ফাঁক দিয়ে অল্প একটু আলো গিয়ে পড়েছিল প্লেটের ওপর, তখনই চোখে পড়ে যায় আমার।'

'তাও ভালো তোর চোখে পড়েছিল, অন্য কোনো ছাত্রের চোখে পড়লে তো ছেলেটাকে বের করে আগে পেটাত।' আমি বলি।

'আমার খুব খারাপ লাগছে এটা ভেবে সে, কতটুকু খিদে পেলে মানুষ খাবার চুরি করতে আসে, তাও আমাদের বয়সী একটা ছেলে!' অনতু আবার মন খারাপ করে ফেলে।

'অসুবিধা নেই। আমার মনে হচ্ছে ছেলেটা আশপাশেই কোথাও না কোথাও থাকে, আমরা ঠিকই একদিন খুঁজে বের করব ওকে।' বিটলু বেশ সাহসী ভঙ্গিতে কথাটা বলে।

অনতু সবার দিকে তাকিয়ে বলে, 'ভালো কথা, কদিন ধরে দুটো জিনিসের কথা ভাবছিলাম। জিনিস দুটো জানা দরকার।'

'কোন দুটো জিনিস?'

'ওই যে রতনরা— ।'

বিটলু অনতুর কথা শেষে করার আগেই বলে, 'রতনরা বাইরে কোথায়

যায় আর নতুন স্যার কেন রাতে ঘুরে বেড়ান, এ দুটো তো?'

'হ্যাঁ।'

মৃদুল কী একটা বলতে নেয়, কিন্তু তার আগেই ক্লাসের ঘণ্টা শোনা যায়। আমরা দ্রুত ক্লাসের দিকে এগিয়ে যাই।

ক্লাসে ঢুকতেই আমাদের ক্লাস ক্যাপটেন সুমন এগিয়ে এসে বলল, 'তোমরা ক্লাসে আসতে এত দেরি করলে কেন?'

বিটলু একটু সুমনের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল, 'কেন, তোর কোনো অসুবিধা আছে?'

'একটা নোটিশ এসেছিল ক্লাসে।'

'কাল প্যারেন্টস ডে, সেই নোটিশ?'

'হ্যাঁ।'

'সেটা তো আমরা জানি।'

নতুন স্যার হাসতে হাসতে ক্লাসে ঢুকলেন। আমরা আমাদের সিটে গিয়ে বসলাম। টেবিলের ওপর রোল-কলের খাতাটা রেখে স্যার বললেন, 'তোমরা জানো তো, কাল প্যারেন্টস ডে?'

'জি স্যার।' ক্লাসের সবাই প্রায় একসঙ্গে বলল।

'কাল তোমরা কে কী করবে বলো তো?'

বিটলু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'সব করব স্যার, স-ব।'

'অনতু তুমি?' স্যার অনতুর দিকে তাকিয়ে বললেন।

অনতু গম্ভীর হয়ে বলল, 'জানি না স্যার।'

স্যার একটু অবাক হয়ে অনতুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার, তোমার মন খারাপ নাকি অনতু?'

'জি না স্যার।'

'তাহলে মুখটা ওমন গম্ভীর করে রেখেছ কেন তুমি?'

'এমনি স্যার।'

'উঁহু, তুমি তো এমনি মুখ গম্ভীর করে রাখার ছেলে না।'

রতন হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'কাল রাতে যে চোর এসেছিল, তার জন্য মন খারাপ ওর।'

'তাই নাকি!' স্যার একটু এগিয়ে এসে বলেন, 'চোরের জন্য মন খারাপ কেন?'

'চুরি করে অনতুকে অর্ধেক ভাগ দেওয়ার কথা ছিল চোরটার, সেটা না দিয়ে চোরটা পালিয়ে গেছে বলে ওর মনটা খারাপ।' রতন হাসতে হাসতে

বলে।

'তাই নাকি?' স্যার একটু কৌতুক করে অনতুর দিকে তাকিয়ে বলেন।

অনতু বলে, 'জি স্যার। কিন্তু ভাগটা রতনকে দিয়ে গেছে বলে ওর মনটা তাই হাসিখুশি। স্যার, দেখেন ও কত আনন্দ নিয়ে হাসছে।'

স্যার রতন আর অনতুর দিকে তাকিয়ে ওদের কথার দিকে না গিয়ে বললেন, 'ভালো কথা, চোরটা পালাল কীভাবে বলো তো?'

'এটা জানা তো খুব সহজ স্যার।' অনতু বলে।

স্যার বেশ আগ্রহ নিয়ে বলেন, 'কীভাবে?'

'চোরটা যাকে ভাগ দিয়েছে সে-ই তাকে পালাতে সাহায্য করেছে।'

'তার মানে তুমি বলতে চাইছ রতন চোরটাকে পালাতে সাহায্য করেছে?' স্যার আবার আগ্রহ নিয়ে অনতুর দিকে তাকান।

'অবশ্যই।'

স্যার এবার রতনের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'রতন, তোমার কি কিছু বলার আছে?'

'বলার তো অনেক কিছুই আছে, কিন্তু এ মুহূর্তে বলতে ইচ্ছে করছে না।'

'তোমরা কি কখনো তর্ক-বিতর্ক করেছ?' স্যার সবার দিকে তাকিয়ে বলেন।

মাথা এদিক-ওদিক নাড়ে সবাই। এটা দেখে আমাদের দিকে আরো একটু এগিয়ে এসে স্যার বলেন, 'ভবিষ্যতে আমার যদি কোনো সুযোগ হয়, তাহলে এ স্কুলে বিতর্ক প্রতিযোগিতা করব আমি, তর্ক-বিতর্ক শেখাব আমি তোমাদের।'

'সেটা করার কি কোনো দরকার আছে স্যার?' অনতু বলে।

'তোমার কি মনে হয় দরকার নেই?'

'একদম না।'

'কেন দরকার নেই?'

'এমনি আমরা প্রতিদিন যেভাবে তর্কবিতর্ক করি, তাতে শেষ পর্যন্ত ঝগড়া লেগে যায় আমাদের মধ্যে, তাই আর নতুন করে তর্কবিতর্ক শেখার কোনো দরকার নেই, একদমই নেই।'

'না, দরকার আছে। বড় হলে এ তর্ক-বিতর্কই তোমার অনেক কাজে লাগবে।'

'কাজে আর কী লাগবে স্যার। আজকাল টিভি খুললেই বিভিন্ন টক শো দেখা যায়, সেখানেই সবাই তর্ক-বিতর্ক করে, কিন্তু কেউ কোনো সমাধান দিতে পারে না।'

'তুমি তো একেবারে বড় মানুষের মতো কথা বললে অনতু!' স্যার কথাটা বলে এগিয়ে এসে অনতুর সামনে এসে দাঁড়ান।

'ক্লাস সেভেনে পড়লে কী হবে, আমি তো আসলে বড়ই হয়ে গেছি।' অনতু স্যারের সামনে উঠে দাঁড়িয়ে বুকটা একটু উঁচু করে বলে।

স্যার অনতুর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেন, 'তা হয়ে গেছ। আচ্ছা, তোমাদের আজকে একটা জিনিস লিখতে দেব—একটা গল্প লিখতে দেব। মাত্র ১০০ শব্দের মধ্যে সে গল্পটা লিখতে হবে। যার গল্প সবচেয়ে ভালো হবে সে পাবে বিশেষ একটা পুরস্কার। তো এবার বলো, কোন বিষয় নিয়ে তোমরা গল্প লিখবে?'

সবাই চুপচাপ, কেউ কিছু বলে না। স্যার সুমনের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'সুমন, তুমি এ ক্লাসের ক্যাপটেন, তুমিই প্রথম বলো।'

সুমন বলল, 'আমি স্যার ক্লাসের কয়েকজন অসম্ভব দুষ্ট ছেলেকে নিয়ে গল্প লিখতে চাই।'

'এত কিছু থাকতে দুষ্ট ছেলেদের নিয়ে কেন? তুমি এ রকম কোনো দুষ্ট ছেলে দেখেছ নাকি?' স্যার সুমনকে জিজ্ঞেস করেন।

'জি স্যার, আমাদের আশপাশেই তো অনেক দুষ্ট ছেলে আছে।'

'তাই নাকি!'

বিটলু হঠাৎ আমাকে খোঁচা দিয়ে বলল, 'শুনলি, সুমন কী বলল? ও কিন্তু আমাদের নিয়েই কথাটা বলল।'

স্যার এবার অনুতর দিকে তাকিয়ে বলল, 'অনতু কী তুমি নিয়ে লিখতে চাও?'

'আমি খুব মজার একটা জিনিস নিয়ে লিখতে চাই।'

'সে মজার জিনিসটা কী?'

'আমাদের ক্লাসে একটা ফার্মের মুরগি পড়ে, এটা নিয়ে আমি একটা গল্প লিখতে চাই।'

অনতুর কথা শুনে সবাই হো হো করে হেসে ওঠে। স্যার হাত দিয়ে ইশারা করে সবাইকে থামিয়ে দিয়ে রতনকে বলেন, 'রতন তুমি?'

'আমি লিখতে চাই— ।' রতন এটুকু বলেই থেমে যায়। তারপর আমাদের দিকে একটু ঘুরে দাঁড়িয়ে অনতুর দিকে তাকিয়ে বলে, 'আমাদের ক্লাসের একটা ছেলে বাথরুমে চুপি চুপি সিগারেট খায়, এটা নিয়ে একটা গল্প লিখতে চাই আমি।'

সবাই আবার হেসে ওঠে। স্যার আবার সবাইকে হাত দিয়ে ইশারা করে থামিয়ে দেন। এবার বিটলুর দিকে তাকিয়ে স্যার বলেন, 'বিটলু, তুমি বলো

তো, তুমি কী নিয়ে গল্প লিখতে চাও?'

বিটলু সিট থেকে উঠে দাঁড়ায়। তারপর রতনের দিকে চোখ দুটো একটু বড় করে তাকিয়ে থেকে বলে, 'আমাদের ক্লাসে একজন মিথ্যাবাদী ছেলে আছে, মিথ্যা বলে সে তার বন্ধুদেরসহ কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকে স্কুলের মাঠে– এটা নিয়ে আমি আমি একটা গল্প লিখতে চাই।'

স্যার সবার কথা শুনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর মিটিমিটি হাসতে হাসতে বললেন, 'তোমাদের সবার কথা শুনলাম। যেহেতু কাল রাতে আমাদের স্কুলে একটা চোর এসেছিল, আমি চাই তোমরা চোর নিয়ে একটা গল্প লেখ। চোর নিয়ে ১০০ শব্দের মধ্যে যে সবচেয়ে ভালো একটা গল্প লিখতে পারবে, তাকে বিশেষ একটা পুরস্কার দেব আমি। কী, লিখতে পারবে তোমরা?'

আমরা সবাই হাত তুলে বললাম, 'জি স্যার, পারব।'

'তাহলে শুরু করো। আজ তো মাসের প্রথম দিন, আমি তোমাদের রোল কলের খাতাটা ঠিক করে তারপর রোল কল করব। ঠিক আছে? এরই মধ্যে তোমরা গল্পটা শেষ করবে। মনে রেখো, যে ভালো গল্প লিখতে পারবে, তার জন্য আছে বিশেষ পুরস্কার।' স্যার তাঁর জায়গায় গিয়ে খাতাটা ঠিক করতে লাগলেন। ব্যাগ থেকে আমরা আমাদের খাতা বের করে চোর নিয়ে রচনা লিখতে লাগলাম।

বিটলু হঠাৎ ফিসফিস করে আমাকে বলল, 'চোর নিয়ে কী লিখব?'

'আমিও তো ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে আমার মনে হয় চোর নিয়ে অনতু ভালো লিখতে পারবে। কারণ একটা কিছু নিয়ে ভাবলে ও অনেক ভালো কিছু লিখতে পারে। কাল রাত থেকে ও তো শুধু চোর নিয়েই অনেক কিছু ভেবেছে।'

অনতুর দিকে তাকালাম আমরা। আমাদের ধারণাই ঠিক, অনতু মাথা নিচু করে এক মনে লিখে যাচ্ছে। দেখে এত রাগ হলো আমাদের! কোনো দিকে তাকাচ্ছে না ও, মাথা নিচু করে এক মনে লিখে যাচ্ছে। আমাদের দিকে একটু তাকালে কী হয়?

মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে উঠে দাঁড়াল অনতু। তারপর স্যারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার লেখা শেষ স্যার।'

রোল কলের খাতা ঠিক করছিলেন স্যার। অনতুর কথা শুনে তিনি অবাক হয়ে বললেন, 'এত তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেললে! দেখি, খাতাটা এদিকে আনো তো দেখি?'

কিছুটা সাহসী ভঙ্গিতে স্যারের কাছে খাতাটা জমা দিয়ে অনতু আবার সিটে

এসে বসল। স্যার রোল কলের খাতাটা পাশে রেখে অনতুর খাতাটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, 'অনতু কী লিখেছে, আমি সেটা একা একা পড়তে চাইছি না। আমি একটু শব্দ করে পড়ি, তোমরাও শোনো।'

বেশ আগ্রহ নিয়ে স্যার পড়তে লাগলেন, 'গভীর রাতে অনেক দিন আগে আমাদের বাড়িতে একটা চোর এসেছিল। কেউ তাকে দেখতে পায়নি, কিন্তু আমি দেখেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমি চিৎকার করে উঠলাম—চোর চোর চোর

দু ঈদের তিন তিন ছয় দিন, সামার ভ্যাকেশনের সাত দিন আর বার্ষিক পরীক্ষার পর দশ দিন আমরা আব্বু-আম্মুর সঙ্গে বাসায় কাটাতে পারি। আরও একটা দিন আমরা আব্বু-আম্মুর সঙ্গে কাটাতে পারি, তবে বাসায় না, স্কুলে। সেই দিনটা হলো আজকের দিন। কারণ আজ আমাদের প্যারেন্টস ডে, আমরা আজ সারা দিন আব্বু-আম্মুর সঙ্গে কাটাব। আজ কোনো লেখাপড়া নেই, ক্লাস নেই, হোমওয়ার্কও নেই। কেউ আজ আমাদের শাসন করবে না, বকাও দেবে না। সারা দিন আজ আমরা হইচই করে ঘুরে বেড়াব, মজা করব ইচ্ছেমতো।

তবে আজকের দিনটা কিছুটা যন্ত্রণারও। আমাদের প্রত্যেকের আব্বু-আম্মু আমাদের প্রত্যেকের জন্য যে পরিমাণ খাবার নিয়ে আসেন, তা দেখে মনে হয়, আমরা প্রতিদিন না-খেয়ে থাকি, স্যাররা আমাদের খেতে দেন না ঠিকমতো। তার পরের যন্ত্রণা হচ্ছে, সেই খাবারগুলো আমাদের এমনভাবে খাওয়ানো হয়, যেন এটাই আমাদের শেষ খাওয়া, এর পরে আমরা আর কোনো দিন খেতে পাব না। খাওয়া শেষ করার পর কারো কারো দিকে তাকালে মনে হয়, তারা ঠিক গলা পর্যন্ত না, মাথার চাঁদি পর্যন্ত খেয়েছে। গত বছর এই খাওয়া নিয়ে একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল।

নিলয় নামে একটা ছেলে আছে, ক্লাস ফাইভে পড়ত তখন, এখন সিক্সে। গত বছর প্যারেন্টস ডেতে আমরা কী একটা খেলা খেলছিলাম। হঠাৎ একটা চিৎকার শুনে আমরা খেলা বন্ধ করে থমকে দাঁড়াই। দেখি, স্কুলমাঠের এক কোনায় বেশ ভিড়। দ্রুত সেখানে দৌড়ে গিয়ে দেখি নিলয় শুয়ে আছে ঘাসের ওপর। ওর আব্বু-আম্মু কাঁদছেন আর হাতে কী একটা নিয়ে বাতাস করছেন নিলয়কে। হেডস্যার কিছুটা দৌড়ে এসে বললেন, 'কী হয়েছে?'

নিলয়ের আম্মু কেঁদে কেঁদে বললেন, 'নিলয় কেমন যেন করছে।'

'কেমন করছে মানে কী?' হেডস্যার একটু উত্তেজিত হয়ে বলেন।

'খাওয়া-দাওয়া করে উঠে দাঁড়িয়েই নিলয় বলে, আম্মু, আমার যেন কেমন লাগছে। বলেই ও ঘামতে থাকে এবং একটু পর শুয়ে পড়ে এখানে।'

'পেটে ব্যথা আছে ওর?'

'সম্ভবত আছে। কথা বলতে বলতে ও পেট হাতাচ্ছিল।'

হেডস্যার বসে পড়েন নিলয়ের পাশে। তারপর ওর মুখের ভেতর একটা আঙুল ঢুকিয়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে হড়হড় করে বমি করতে থাকে নিলয় এবং অনেকক্ষণ ধরে বমি করতে থাকে। বমি শেষে হেডস্যার ওকে বলেন, 'এখন কেমন লাগছে বাবা?'

নিলয় কিছুটা আনন্দ নিয়ে বলে, 'খুব ভালো লাগছে।'

'পেটে কোনো যন্ত্রণা নেই তো এখন?'

'না।'

নিলয়ের আব্বু-আম্মুর দিকে এবার ঘুরে তাকান হেডস্যার। বিশেষ করে নিলয়ের আম্মুর দিকে তাকিয়ে বলেন, 'আপনি ওকে কী করেছেন বলেন তো?'

'কই, তেমন তো কিছু করিনি!'

'আপনার মনে হচ্ছে আপনি কিছু করেননি, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আপনি ওকে মেরে ফেলতে চেয়েছেন।'

'এটা আপনি কী বলছেন!' নিলয়ের আম্মু চোখ দুটো বড় বড় করে বলেন আর অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন হেডস্যারের দিকে।

'হ্যাঁ, আমি ঠিকই বলছি। আপনি আপনার সন্তানকে এমনভাবে খাইয়েছেন, ও যে অক্সিজেন নেবে সেই জায়গাটুকু নেই ওর পেটে। এবার আপনিই বলুন, অক্সিজেন ছাড়া কি কেউ বাঁচে?'

নিলয়ের আম্মু অপরাধীর মতো বলেন, 'আমি আসলে ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি।'

'বোঝার কথাও না। আমাদের মায়েরাও বুঝতে পারতেন না, আসলে অধিকাংশ মা-ই বুঝতে পারেনি না। আমাদের একটু শুকনো মুখ দেখলেই মনে করেন, আমরা বুঝি খাই না, খেতে পাই না। তারা তখন যত কিছু পারেন আমাদের পেটে ঢোকাতে চেষ্টা করেন। আমাদের মায়েরা আসলে তাদের স্নেহ, মায়া, মমতা, ভালোবাসা দিয়েই সবকিছু দেখতে চান, অন্য কিছু তারা মোটেই দেখতে চান না।' কথাগুলো বলতে বলতে হেডস্যারের চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে।

সম্ভবত আজও হেডস্যার সেই কথাগুলো বলবেন। কারণ আম্মু আমার হাত ধরে চেপে বসে আছে, আর আম্মুর সামনে একগাদা খাবার। যার বেশিরভাগই খেতে হবে আমাকে। আম্মু মনটা খারাপ করে বলল, 'তুই কেমন যেন শুকিয়ে গেছিস!'

আমি আমার হাত পায়ের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বললাম, 'কই শুকিয়ে গেছি।'

'শুকিয়ে যাসনি তো কী হয়েছিস?'

'তোমার সঙ্গে দেখা হলেই তো তুমি এ কথাটা বলো। প্রতিবার দেখো আর বলো, তুই আগের চেয়ে শুকিয়ে গেছিস। প্রতিবার যদি আমি একটু একটু করে শুকিয়ে যাই, তাহলে তো এত দিনে আমার শরীরে কিছু থাকার কথা না আম্মু।' আমি হাসতে হাসতে বলি।

আম্মুও হাসতে হাসতে বলে, 'তোর প্রিয় খাবারগুলো রান্না করে নিয়ে এসেছি আমি।'

'ভালো করেছ, কিন্তু এত খাবার কে খাবে?'

'তুই খাবি।' আম্মু এমনভাবে কথাটা বলে, যেন খাওয়াটা খুব সহজ একটা ব্যাপার।

'এত খাবার আমি খেতে পারব!'

'তুই না পারিস তোর বন্ধুরাও খাবে।'

'ওদের আম্মু-আব্বু ওদের জন্য খাবার নিয়ে এসেছে না? ওই সব খেয়েই তো পেটটা বড় করে নড়তে পারবে না ওরা।'

'তুই খা তো! যতটুকু পারিস খা, বাকিটুকু পরে দেখা যাবে।'

একটা একটা করে খাবার আম্মু আমার প্লেটে তুলে দিচ্ছে, আমি তা খাওয়ার চেষ্টা করছি। খেতে খেতে মুখ নড়াচড়া করা বাদ দিয়ে একটু রেস্ট নিতে গেলেই আম্মু ধমক দিয়ে বলে, কিরে, খাচ্ছিস না কেন? আমি আম্মুর দিকে তাকাই আর হাসি। আমি তো জানি, বাসায় থাকি না বলে আম্মু আমার প্রিয় খাবারগুলোর একটাও রান্না করে না। ঈদে কিংবা অন্য কোনো ছুটিতে গেলে কেবল সেগুলো রান্না করে। আর এখানে যেদিন আসে, সেদিন রান্না করে। একদিন কী একটা প্রিয় খাবার নাকি রান্না করেছিল আম্মু, কিন্তু বাসায় ছিলাম না আমি তখন, স্কুলে ছিলাম। আম্মু খেতে বসে সে খাবার নাকি খেতেই পারেনি। কথাটা শুনে আমি সেদিন অনেক কেঁদেছিলাম।

বিটলু হঠাৎ দৌড়ে এসে বলল, 'দীপ্র, অনতুকে দেখেছিস?'

মাঠের ওপর থেকে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াই আমি, 'না তো! কেন, কিছু হয়েছে নাকি ওর?'

'ওকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'কোথায় গেছে ও?'

'সেটাই তো জানি না।'

'মৃদুল আর অয়ন কোথায়?'

'ওরাই তো আমাকে ব্যাপারটা জানাল। মৃদুলের আম্মু নাকি আমাদের পাঁচজনকে একসঙ্গে দেখতে চেয়েছেন। তখন অয়নকে সঙ্গে নিয়ে অনতুকে খুঁজতে গিয়ে দেখে অনতু নেই।'

'ওরা কি এখনো অনতুতে খুঁজছে?'

'হ্যাঁ, ওরা এখন স্কুলের ওই দিকে খুঁজতে গেছে অনতুকে।'

'চল তো।' আমি আম্মুর দিকে তাকিয়ে বলি, 'আম্মু, তুমি একটু বসো, আমি একটু ঘুরে আসি। আব্বু তো আঙ্কেলদের সঙ্গে গল্প করছে ওই যে স্কুলের বারান্দায়, আব্বুকে পাঠিয়ে দেব?'

'না, গল্প করছে করুক। তুই একটু তাড়াতাড়ি আসিস।' আম্মু বিটলুর দিকে তাকিয়ে বলে, 'বিটলু, তুমি খেয়েছ?'

'জি আন্টি।'

'পেট ভরে খেয়েছ তো?'

'না তো!'

'তাহলে?'

'শুধু পেট না আন্টি—নাক, কান, চোখ, মাথা সব ভরে খেয়েছি। আম্মু একটা জায়গাও খালি রাখতে দেয়নি।' বিটলু হাসতে হাসতে বলে। বিটলুর কথা শুনে আম্মুও হাসতে থাকে।

স্কুলের গোপন চত্বরের কাছে এসে আমরা একসঙ্গে হই। তারপর চারজন মিলে সারা স্কুল তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকি, কিন্তু কোথাও খুঁজে পাই না অনতুকে। খুঁজতে খুঁজতে আমরা বিকেল করে ফেলি, তবু খুঁজে পাই না। সন্ধ্যার সময় আমাদের সবার আম্মু-আব্বু চলে যাওয়ার পরও খুঁজতে থাকি, অনতু নেই, কোথায় যেন উধাও হয়ে গেছে ও।

মাঝরাতের দিকে অনতু এসে আমাকে ফিসফিস করে ডেকে বলে, 'দীপ্র, একটু বাইরে আসবি?'

আজ রাতে আমাদের বাইরে যাওয়ার কথা না। সারা দিন লাফালাফি, খেলাধুলা, খাওয়া-দাওয়া, তারপর অনতুকে খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত হয়ে গেছি আমরা। কিন্তু এ মুহূর্তে অনতুকে দেখে সব ভুলে গেলাম আমি। প্রায় খামচে ওর একটা হাত চেপে ধরে বললাম, 'সারা দিন কোথায় ছিলি তুই?'

'ছিলাম এক জায়গায়।'

'সেই এক জায়গাটা কোথায়?'

'বাঁধের পাশে যে বটগাছটা আছে, সেখানে ছিলাম।'

'ওখানে কী করছিলি তুই?'

'কিছু না। বটগাছে উঠে চুপচাপ বসে ছিলাম।'

'কাল না প্যারেন্টস ডে ছিল! তোর আব্বু-আম্মু আসেননি?'

অনতু কিছু বলে না।

আমি ওর হাতটা একটু জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলি, 'কী বললাম, তোর আব্বু-আম্মু আসেননি?

'বাদ দে ওসব।' অনতু আমার হাত থেকে ওর হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, 'শোন, একটা কথা বলতে এসেছি তোকে।'

'কী কথা?'

'আগে রুমের বাইরে আয়, তারপর বলি।'

রুমের বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গে অনতু আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, 'একটা কথা বলব তোকে। কথাটা কেবল তুই জানবি, আর কাউকে জানাতে পারবি না।'

'কী কথা?'

'আগে বল কাউকে জানাবি না?'

'কথাটা আগে বলবি তো!'

অনতু একটু চুপ করে থেকে বলে, 'আমি আজ পালাচ্ছি।'

বুকের ভেতর কেমন যেন করে ওঠে আমার। আমি আবার অনতুর একটা

হাত প্রায় খামচে ধরে বলি, 'কোথায় পালাবি তুই!'

'জানি না।'

অনতুর দিকে ভালো করে তাকাই আমি। ওর চোখ দুটো কেমন যেন ফোলা ফোলা লাগছে। মনে হচ্ছে সারা দিন ও কেঁদেছে। আমি ওর হাতটা আরো একটু জোরে চাপ দিয়ে বলি, 'কেন পালাবি তুই?'

'তাও জানি না।'

অনতুর মাথার একপাশে হাত রাখি আমি। তারপর বেশ কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে বলি, 'আমাদের ছেড়ে পারবি তুই পালাতে?'

কিছু বলে না অনতু। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। মাথা নিচু হয়ে আসে আমারও। আমি টের পাচ্ছি আস্তে আস্তে চোখ দুটো ভিজে আসছে আমার।

অনতু দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, 'চল না, আজ সারা রাত স্কুলের মাঠে বসে কাটাই। দেখেছিস, কী সুন্দর চাঁদ উঠেছে!'

অনতুকে সঙ্গে নিয়ে স্কুলের মাঠে এসে বসি আমি। উদাস হয়ে অনতু তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। চাঁদ দেখছে ও, মুগ্ধ হয়ে দেখছে। আর আমি দেখছি ওকে। চাঁদের আলোতে ওর মুখটা কেমন ফরসা ফরসা লাগছে, চিকচিক করছে ওর চুলগুলো।

'চল, শুধু আমরা দুজন আজ বাইরে যাব।' অনতুর চিন্তাটা অন্য দিকে নেওয়ার জন্য কথাটা বলি আমি।

'বাইরে কোথায় যাব?' অনতু আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে বলে।

'সোহেলদের বাসার পাশে তিন-চারটা পেয়ারাগাছ আছে না, কয়েক দিন আগে দেখছিলাম অনেকগুলো ছোট ছোট পেয়ারা ধরে আছে, এখন বোধহয় বড় হয়েছে। চল না, একবার গিয়ে দেখে আসি। যদি সুযোগ হয়, তাহলে...।' অনতুর দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকাই আমি। কিন্তু অনতু তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে, আগের মতোই চাঁদ দেখছে ও।

আমি আবার বলি, 'যাবি না?'

'না, কোথাও আর যেতে ইচ্ছে করে না।'

'বিটলু, মৃদুল, অয়নকে ডেকে তুলি?'

'না, ওরা ঘুমাচ্ছে ঘুমাক।'

'একটা অনুরোধ করব তোকে?'

কিছু বলে না অনতু। আমার কথা শুনে মাথাটা নিচু করে ফেলে। বেশ কিছুক্ষণ সেভাবে বসে থেকে শব্দ করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, 'অনুরোধ? আচ্ছা, বল।'

'তুই কি সত্যি করে বলবি, কেন তুই পালাতে চাস?' অনতুর পায়ের ওপর

একটা হাত রেখে বলি আমি।

'না, বলব না।'

'কেন বলবি না?'

'বলতে ইচ্ছে করছে না।' অনতু আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকেই বলে।

'পালালে তুই লেখাপড়া করবি কোথায়?'

'লেখাপড়া করব না।'

'এটা কী বলছিস তুই! লেখাপড়া না করলে মানুষ কী বলবে!'

'কী আর বলবে, মূর্খ বলবে।'

'তোকে কেউ মূর্খ বললে তোর ভালো লাগবে?'

আকাশ থেকে মুখ ঘুরিয়ে অনতু আমার দিকে তাকায়, কিন্তু কিছু বলে না। আমি অনতুর পায়ের ওপর আরো চাপ দিয়ে বলি, 'তোকে আরেকটা অনুরোধ করি?'

অনতু এবারও কিছু বলে না। আমি ওর দিকে একটু ঝুঁকে বসে খুব আন্তরিকভাবে বলি, 'তুই আরো কয়েকটা দিন একটু ভেবে দেখবি? মৃদুল, বিটলু, অয়নও তো তোর বন্ধু, ওদেরও তো তোর জানানো দরকার। তুই ওদের না বলে কোথাও চলে গেলে ওরা কষ্ট পাবে না? তুই কি চাস, তোর জন্য ওরা কষ্ট পাক? কাল সারা দিন আমরা সবাই মিলে তোকে কত খুঁজেছি, কাল সারা দিন আমাদের কত মন খারাপ ছিল!'

অনতু চুপচাপ বসে থাকে। একটু পর হঠাৎ একটু সোজা হয়ে সামনের দিকে হাত এগিয়ে দিয়ে বলে, 'দেখ।'

সামনের দিকে তাকালাম আমি। নতুন স্যার তাঁর রুম থেকে বের হয়ে এসেছেন। তিনি বারান্দা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটু পর স্কুলের মাঠের দিকে চলে এলেন। তারপর এগিয়ে আসতে লাগলেন আমাদের দিকে। আমরা তবু বসে রইলাম। কারণ আমরা তো জানি, স্যার আমাদের দিকে এলেও আমাদের দেখতে পাবেন না।

স্যার হেঁটে আসতে আসতে সত্যি সত্যি আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেলেন। তিনি আমাদের এত কাছ দিয়ে হেঁটে গেলেন, আমরা দুজন যে বসে আছি, এটা অবশ্যই স্যারের দেখার কথা এবং কথা বলার কথা আমাদের সঙ্গে। কিন্তু কথা বলা দূরে থাক, ফিরেও তাকালেন না স্যার।

অনতু হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'একটা কাজ করবি?'

আমিও উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'কী?'

'চল, আমরা স্যারের পাশে পাশে হাঁটি।'

'কেউ দেখে ফেলবে তো!'

'এত রাতে কে দেখবে? যদি দেখেও, ভাববে আমরা স্যারের সঙ্গে লেখাপড়া নিয়ে জরুরি কোনো কথা বলছি।'

স্যার আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। আবার তিনি আমাদের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে অনতু আমার হাত ধরে টান দিল। আমরা নতুন স্যারের পাশ দিয়ে হাঁটতে লাগলাম আর তাঁকে দেখতে লাগলাম। অথচ স্যার জানতেই পারছেন না তাঁর পাশাপাশি আমরাও হাঁটছি, আমরা তাঁকে পর্যবেক্ষণ করছি গভীরভাবে। চাঁদের আলোয় আমাদের তিনজনের ছায়া অনেক লম্বা দেখাচ্ছে, লম্বা ভূতের ছায়ার মতো লম্বা!

ঘুম থেকে উঠেই প্রথমে অনতুর কথা মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতর কেমন যেন করে উঠল আমার। গত রাতে নতুন স্যারের পাশে হাঁটতে হাঁটতে স্যার তাঁর রুমে ঢুকে যাওয়ার পরও আমরা আরো অনেকক্ষণ হেঁটেছি। ভোররাতের দিকে অনতু ওর রুমে চলে যায়, আমি আমার রুমে চলে আসি।

আজ আমাদের সাপ্তাহিক ছুটির দিন। আজ ক্লাসে যেতে হবে না আমাদের। এ দিনটায় আমরা এক ঘণ্টার জন্য স্কুলের বাইরে যেতে পারি, যেখানে খুশি সেখানে বেড়াতে পারি।

দ্রুত বাথরুম থেকে ঘুরে এসে আমি অনতুর রুমে চলে আসি। অনতু নেই, কেউ বলতেও পারে না ও কোথায় গেছে। আরো খারাপ লাগা শুরু হয়ে যায় বুকের ভেতর।

কিছুই ভালো লাগছে না আমার। আমি আবার আমার রুমে চলে আসি। কিন্তু রুমে না ঢুকে বারান্দার সিঁড়ির ওপর বসে পড়ি। এখনো অনেকে ঘুম থেকে ওঠেনি। ছুটির দিন, স্কুলের লাইনে দাঁড়াতে হবে না, সকালের হোমওয়ার্ক করতে হবে না, ক্যান্টিনে গিয়ে নাশতাও একটু দেরিতে খেলে কোনো কমপ্লেন যাবে না স্যারদের কাছে।

মাথার ভেতর কত রকমের ভাবনা এসে ঘুরপাক খাচ্ছে—রতনরা রাত করে বাইরে গিয়ে কী করে, নতুন স্যার রাতে এভাবে হাঁটেন কেন, অনতু কেন পালাতে চাইছে। রাস্তায় ট্রাফিক জ্যামের মতো মাথার ভেতর কেমন যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে সব।

বসে বসে ভাবছিলাম। বিটলু, মৃদুল আর অয়ন চুপিচুপি কখন যে আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে, টেরই পাইনি। বিটলু হঠাৎ হালুম করে চিৎকার করে উঠে আমার পিঠে একটা হাত রেখে বলে, 'কী রে, একা একা এখানে বসে কী করছিস?'

'কিছু না।'

'মন খারাপ নাকি তোর?'

পেছন থেকে ওরা আমার পাশে এসে বসে। আমি ওদের দিকে তাকিয়ে বলি, 'অনতুর কোনো খবর জানিস?'

'ওর খবর নেওয়ার জন্যই তো তোর কাছে এলাম। ভাবলাম অনতুর রুমে যেহেতু যাব, তাহলে সবাই মিলেই যাই।'

'রাতে অনতু আমার রুমে এসেছিল।'

'কখন?' মৃদুল আমার দিকে ঝুঁকে এসে বলে।

'বেশ রাত হবে তখন।'

'কী বলল এসে?' অয়নও আমার দিকে ঝুঁকে এসেছে।

'ও নাকি পালাবে।'

'পালাবে!' বিটলু কিছুটা শব্দ করে বলে, 'কোথায় পালাবে?'

'তা বলেনি।'

'কেন পালাবে, তা বলেছে?'

'না, তাও বলেনি।'

'ও এখন কোথায়?' মৃদুল বেশ উত্তেজনা নিয়ে বলে।

'জানি না।'

'ওর রুমে নেই?'

'না, নেই।'

'তুই গিয়েছিলি ওর রুমে?'

'হ্যাঁ।'

'কখন?'

'এই তো কিছুক্ষণ আগে।'

বিটলু লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'চল তো, অনতুর রুম থেকে আবার ঘুরে আসি।'

সঙ্গে সঙ্গে মৃদুলও উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'চল।'

অনতুর রুমে আবার এসে দেখি, অনতু এখনো নেই। বিটলু ওর বিছানায় বসে কী যেন ভাবতে থাকে। তারপর রুমের চারপাশটা দেখে বলে, 'তোদের কী মনে হয়, অনতু সত্যি সত্যি পালিয়েছে?'

মৃদুল বিটলুকে বলে, 'তোর কী মনে হয়?'

'আমার মনে হয় পালায়নি।'

'তুই কী করে বুঝলি পালায়নি?' অয়ন জিজ্ঞেস করে।

'দেখছিস না, ওর কোনো কিছুই নিয়ে যায়নি।'

'তাহলে ও গেল কোথায়?' আমি সবার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে বিটলুর পাশে বসি।

'আমার মনে আরেকটা প্রশ্ন এসেছে।' অয়ন বলে।

মৃদুল অয়নের দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে বলে, 'কী প্রশ্ন?'

'অনতু তো এত দিন কোনো কিছু বলেনি, কিন্তু হঠাৎ পালাতে চাইছে কেন?'

'ভালো বলেছিস তো তুই!' মৃদুল কপাল কুঁচকে বলে, 'সত্যি তো, অনতু কেন পালাতে চাইছে?'

দরজায় খুট করে শব্দ হতেই দরজার দিকে তাকিয়ে দেখি নতুন স্যার দাঁড়িয়ে আছেন সামনে। আমাদের দেখেই হেসে হেসে অনতুর রুমে ঢুকে বললেন, 'তোমরা সবাই তো দেখি এখানেই আছো।' স্যার চারপাশটা ভালো করে তাকিয়ে দেখতে দেখতে বললেন, 'অনতুকে দেখছি না যে, অনতু কোথায়?'

আমরা কেউ কোনো কথা বলি না। সবাই মাথা নিচু করে বসে আছে। কেবল আমি তাকিয়ে আছি স্যারের দিকে, কিছুটা অবাক হয়েই তাকিয়ে আছি—এই মানুষটার পাশে পাশে আমি আর অনতু রাতে হেঁটেছি, কিন্তু তিনি কিছুই জানেন না। হঠাৎ বুকের ভেতর একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ওঠে আমার—আচ্ছা, স্যার আমাদের সঙ্গে কোনো চালাকি করছেন না তো! হয়তো তিনি সবই জানেন, কিন্তু আমাদের বুঝতে দিচ্ছেন না! একটু পর আবার মনে হয়, স্যার যদি আমাদের সঙ্গে চালাকিই করে থাকেন, তবে কেন চালাকি করছেন? কোনো রহস্য আছে কি এর মধ্যে?

সারা দিন আমরা অনতুকে খুঁজেছি, কিন্তু কোথাও পাইনি। ছুটির দিনে আমরা যে এক ঘণ্টার জন্য বাইরে যাওয়ার সুযোগ পাই, সেই এক ঘণ্টা বাইরে গিয়েও খুঁজেছি, পাইনি। বাঁধের পাশে বটগাছের নিচে গিয়ে অপেক্ষা করেছি অনেকক্ষণ, অনতু নেই সেখানেও।

সবশেষে সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি আজ রাতেই স্যারের রহস্যটা জেনে ফেলব আমরা—স্যার কি কোনো চালাকি করছেন, না অন্য কিছু? এক ধরনের উত্তেজনায় বেশ আনন্দ হচ্ছে আমাদের। কিন্তু মনটা খারাপ হয়ে আছে আরো বেশি। কারণ এই প্রথম অনতুকে ছাড়াই কোনো একটা কাজে বের হব আমরা। ভীষণ খারাপ লাগছে আমাদের, ভীষণ।

রাতে আমরা যেদিন বের হই, সেদিন আগেভাগেই পরের দিনের স্কুলের পড়াটা শেষ করে ফেলি। কিন্তু পড়া শেষ করা তো দূরের কথা, বইও ছুঁয়ে দেখিনি আজ, এমনকি পড়ার টেবিলের কাছেও যাইনি। বিকেল গেল, সন্ধ্যা গেল, এক মুহূর্তের জন্যও পড়তে বসিনি আমরা। কেমন যেন লেগেছে সারাটাদিন, সারাক্ষণ শুধু মনে হয়েছে অনতু নেই।

স্কুলের গোপন চত্বরের কাছে বসে আছি আমরা। চুপচাপ বসে আছি। অনতু থাকলে কত রকম মজা করত!

রাত এখন ঠিক কত তা বুঝতে পারছি না। তবে আমাদের ধারণা, একটু পরেই নতুন স্যার তাঁর রুম থেকে বের হয়ে আসবেন। তার পরই আমরা আমাদের পরিকল্পনামতো শুরু করে দেব কাজটা।

খুব ভেবেচিন্তে আমরা এবার একটা পরিকল্পনা করেছি। অবশ্য বড় ধরনের কোনো কাজ করার আগে সবাই মিলে ছোট হোক বড় হোক পরিকল্পনা একটা করে থাকি আমরা। তবে এবারের পরিকল্পনাটা যে সম্পূর্ণ অন্য রকম, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আমাদের পরিকল্পনাটা হলো, স্যার রুম থেকে বের হওয়ার পর আমরা তাঁকে কিছুক্ষণ ফলো করব। তিনি বারান্দা থেকে নেমে স্কুলের মাঠে এসে হাঁটাহাঁটি করবেন, আমরাও তাঁর পাশাপাশি হাঁটব। হাঁটতে হাঁটতে তাঁকে খেয়াল করব, তাঁকে বোঝার চেষ্টা করব, তাঁর উদ্দেশ্য জানব। যদি দেখি, তিনি আগের মতোই চুপচাপ হেঁটে যাচ্ছেন, কোনো দিকে তাকাচ্ছেন না, আমাদের পাত্তা দিচ্ছেন না, ঠিক তখনই স্যারকে জাপটে ধরব আমরা। আমি আর অয়ন ধরব দু হাত, মৃদুল ধরবে পা, আর বিটলু চেপে ধরবে স্যারের মুখ, যাতে কোনো রকম শব্দ করতে না পারেন তিনি।

স্যারকে তারপর বেঁধে ফেলব একটা গাছের সঙ্গে, তার জন্য দড়িও নিয়ে এসেছি আমরা, আর স্যারের মুখ বাঁধার জন্য কাপড়। কাপড় আর কী, বিটলু ওর গামছাটা নিয়ে এসেছে। বাঁধা শেষ হলেই স্যারকে ঘিরে ফেলব আমরা।

আস্তে আস্তে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াব একটু পর। বোঝার চেষ্টা করব, স্যার আমাদের দেখে স্বাভাবিক আছেন, না রেগে আছেন তিনি? যদি রেগে না থাকেন, তাহলে তাঁর মুখে বাঁধা গামছাটা খুলে দেব আমরা। তারপর স্যারের দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে প্রথম প্রশ্নটা করবে বিটলু, 'স্যার, কেমন আছেন?'

যদি দেখি স্যার কোনো উত্তর দিচ্ছেন না, তাহলে স্যারকে আমরা বলব, 'স্যার, কথা না বললে কিন্তু খবর আছে আপনার!' তার পরও যদি কথা না বলেন তিনি, তাহলে আবার বলব, 'কোনো কথা না বলতে চাইলে হাত দিয়ে ইশারা করে উত্তর দিলেই চলবে। এর জন্য আমরা আপনার হাতে বাঁধা দড়িটাও খুলে দেব। কী, আপনি রাজি? তবে আপনাকে কঠিন কোনো প্রশ্ন করব না, সাধারণ কিছু প্রশ্ন করব। এই যেমন, মাঝরাতে রাতে বিছানায় শুয়ে ঘুমানো বাদ দিয়ে শেয়ালের মতো আপনি হেঁটে বেড়ান কেন? কিংবা রাত হলেই কি আপনার ওপর পাগল ভর করে?' তার পরও যদি স্যার কথা না বলেন, তাহলে কাতুকুতু দেব আমরা। শুধু একজন না, সবাই মিলে দেব। শেষ পর্যন্ত স্যার যদি কথা না-ই বলেন, তাহলে তাঁকে আমরা গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখেই আসব। তারপর সকালে ঘুম থেকে উঠে সবাই যখন স্যারকে এভাবে দেখবে, তখন একটা একটা করে স্যারের সব খবর জেনে যাবে সবাই।

স্যারের জন্য বসে আছি আমরা, একেবারে একশ পার্সেন্ট প্রস্তুত হয়ে বসে আছি। ঘর থেকে বের হয়ে আসার পর মাত্র কয়েক মিনিট, তার পরই...। উত্তেজনায় আমরা চারজন প্রায় কাঁপছি। এত দিন আম চুরি করেছি, আনারস চুরি করেছি, পেয়ারা চুরি করেছি। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের বয়সী ছেলেরা এসব করেই থাকে, কিন্তু পৃথিবীর কোথাও কোনো স্যারকে কোনো ছাত্র রাতে গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে কি না আমাদের জানা নেই। সম্ভবত আমরাই প্রথম, একটু চেষ্টা-ফেষ্টা করলে এর জন্য আমরা গিনেজ বুক অব রেকর্ডে নামও তোলাতে পারি আমাদের।

গভীর মনোযোগ দিয়ে সবাই তাকিয়ে আছি স্যারের দরজার দিকে। হঠাৎ চটাস করে একটা শব্দ হলো। সঙ্গে সঙ্গে বিটলু অয়নের দিকে তাকিয়ে বলল, 'শব্দ করলি কেন তুই?'

'একটা মশা বসেছিল গালে।' অয়ন বলল।

'গালে মশা বসেছিল, তাহলে আমাকে বলবি তো! গালের মশা আমি খুব ভালো মারতে পারি। এরপর তোর গালে কোনো মশা বসলে আমাকে বলিস।'

অয়ন কী বুঝল জানি না, কিছুটা উৎফুল্ল হয়ে বিটলুকে বলল, 'আমার গালে বোধহয় আরেকটা মশা বসেছে।'

বিটলু একটু ঘুরে বসে সঙ্গে সঙ্গে অয়নের বাঁ গালে ঠাস করে একটা থাপ্পড় মারল।

'এই গালে মারলি কেন?'

'কোন গালে মারব?'

'মশা তো বসেছে এই গালে।' অয়ন ওর ডান গালটা দেখিয়ে রাগী রাগী চোখে বিটলুর দিকে তাকাল।

'স্যরি, এরপর যে গালে মশা বসবে সে গালেই থাপ্পড় মারব আমি, কোনো ভুল হবে না আমার।'

অয়ন কী যেন বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই মৃদুল ওকে হাত দিয়ে ইশারা করে থামিয়ে দিল। স্যারের দরজাটা খুলে যাচ্ছে, একটু পর স্যার বের হয়ে এলেন, তারপর বারান্দায় এসেই আবার ঢুকে গেলেন রুমে।

অধীর আগ্রহে আমরা বসে আছি। কিন্তু স্যার আর বের হচ্ছেন না। অয়ন আবার একটা শব্দ করল। এবার মৃদুল একটু রেগে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'শব্দ করছিস কেন অয়ন?'

'মশা।'

মৃদুল কিছু বলার আগেই বিটলু বলল, 'মশা! তা আমাকে বলবি তো! আমি মেরে দিতাম মশাটা।'

রাগী চোখে অয়ন বিটলুর দিকে তাকাল। কিন্তু বিটলু তাকিয়ে আছে অন্য দিকে। ও তাকিয়ে আছে আমরা যেখান দিয়ে দেয়াল টপকে বাইরে যাই সেদিকে। ওর দেখাদেখি আমিও তাকিয়ে আছি ওদিকে। একটু পর বিটলু মৃদুলের কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, 'দেখতে পাচ্ছিস?'

মৃদুল স্যারের দরজার দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, স্যারকে আবার বের হতে দেখা যাচ্ছে।'

স্যারের দরজার দিকে তাকালাম আমি। হ্যাঁ, স্যার দরজা খুলে বের হয়ে এসেছেন আবার। তিনি আস্তে আস্তে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন।

বিটলু দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থেকেই বলল, 'আরে স্যার না, ওই দেখ স্কুলের ভেতর থেকে বাইরে যাচ্ছে কারা!'

মৃদুল ঘুরে স্কুলের দেয়ালের দিকে তাকাল, আমিও তাকালাম। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলাম আমরা। রতনরা দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা একজন

একজন করে দেয়ালের পাশের গাছে উঠে স্কুলের বাইরে যাচ্ছে। বিটলু কিছুটা উত্তেজনা নিয়ে মৃদুলের একটা হাত চেপে ধরে বলল, 'আজ স্যারের প্রসঙ্গ বাদ, আমরা আজ রতনদের ফলো করব।'

'কেন?' মৃদুল বলল।

'স্যার তো প্রতি রাতেই রুম থেকে বের হয়ে হাঁটেন, স্যারের ব্যাপারটা আমরা তাই কালও দেখতে পারব। কিন্তু রতনরা কবে কবে স্কুলের বাইরে যায়, তা তো আমরা জানি না। আজ যেহেতু সুযোগ পেয়েছি, সেহেতু আজই ওদের ফলো করা উচিত আমাদের।'

বিটলুর কথা শুনে মৃদুল কী যেন ভাবল, তারপর বলল, 'তুই ঠিকই বলেছিস। চল, আমরা আজ রতনদের ফলো করব।'

স্যার বারান্দা থেকে নেমে স্কুলের মাঠে হাঁটছেন এখন। আমরা স্যারের পেছন দিয়ে দেয়ালের কাছে এসে দ্রুত স্কুলের বাইরে এসে দেখি, রতনরা অনেক দূর চলে গেছে। বিষয়টা দেখে বিটলু বলল, 'খুব নিঃশব্দে, চুপি চুপি রতনদের পিছু নিতে হবে আমাদের। ওরা যেন একটুও টের না পায়, তাহলে কিন্তু ওরা আমাদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাবে।'

রতনদের পিছু পিছু আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। রাস্তার পাশে গাছের আড়াল দিয়ে দিয়ে পা টিপে টিপে এগোচ্ছি। ঝন্টু হঠাৎ কেন যেন পেছন দিকে ঘুরে দাঁড়াল, ঘুরে দাঁড়াল রতনও। ওদের এই ঘুরে দাঁড়ানো দেখে আমরাও দ্রুত রাস্তার আরো আড়ালে চলে এলাম। ইস্! অল্পের জন্য ধরা পড়ে গিয়েছিলাম।

গাছের আড়াল থেকেই রতনদের দেখা যাচ্ছে। ওরা কিছুক্ষণ পেছনের দিকে তাকিয়ে থেকে আবার এগোতে লাগল। আমরাও এগোতে লাগলাম ওদের সঙ্গে সঙ্গে।

বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর রতনরা বাঁয়ের একটা গলিতে ঢুকে পড়ল। একটু পর আমরাও সে গলিতে ঢুকে পড়লাম। অন্ধকার গলি। তেমন কিছুই দেখা যাচ্ছে না। অয়ন আমার একটা হাত ধরল, আমরা একে অপরকে ধরে গলিটা পার হলাম। চমকে উঠলাম আমরা সঙ্গে সঙ্গে। রতনদের আর দেখা যাচ্ছে না। চারদিকে আরো বেশি অন্ধকার। আমি বিটলুকে ফিসফিস করে বললাম, 'এবার কোন দিকে যাব আমরা?'

বিটলুও ফিসফিস করে বলল, 'বুঝতে পারছি না তো।'

'আমরা বরং সামনের দিকে একটু এগিয়ে যাই।' মৃদুল বলল।

'সামনের দিকে গিয়ে হবে?' অয়ন ভয় ভয় গলায় বলল।

'দেখি না কী আছে সামনে।'

হাতধরাধরি করে আমরা সামনের দিকে এগোতে লাগলাম। কিছুদূর যাওয়ার পর রাস্তার ঢাল, সেখানে বস্তির মতো জায়গা দেখা যাচ্ছে একটা। সারা বস্তি অন্ধকার, দু-একটা ঘরে অল্প আলোর লাইট জ্বলছে। ভালো করে তাকাতেই দেখি, কোনার একটা ঘরে একটু বেশি আলো জ্বলছে এবং সেখান থেকে সুর করে পড়ার শব্দ আসছে।

বিটলু আমাদের দিকে তাকিয়ে চোখ দিয়ে ইশারা করল। আমরা একসঙ্গে পা টিপে টিপে এগোতে লাগলাম ঘরটার দিকে। আমরা যতই ঘরের কাছাকাছি যাচ্ছি, ততই পড়ার শব্দটা জোরে শুনতে পাচ্ছি।

ঘরের একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমরা। কান পেতে বোঝার চেষ্টা করলাম এত রাতে কারা পড়ছে, কারা পড়াচ্ছে? বস্তির এ ঘরটার চারপাশে বাঁশের বেড়া, ছোট ছোট ছিদ্র দিয়ে ঘরের ভেতরের আলো বাইরে বের হয়ে এসেছে। বেড়ার ছিদ্র দিয়ে ভেতরটা দেখার জন্য বিটলু এগিয়ে যেতে নিয়েই থেমে গেল। কে যেন বেশ শব্দ করে ধমক দিল কাকে। বিটলু আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে আগের মতোই ফিসফিস করে বলল, 'কার গলার শব্দ, বল তো?'

আমিও ফিসফিস করে বললাম, 'কার গলার শব্দ?'

'টোটনের গলার শব্দের মতো মনে হলো!'

'টোটন আসবে কেন এখানে?' মৃদুল বলল।

'আমরা এসেছি কেন এখানে?' বিটলু মৃদুলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'টোটন তো এখানে আসতেও পারে। তা ছাড়া— ।'

বিটলু কথা শেষ করতে পারল না। তার আগেই আরেকজন অল্প শব্দ করে কাকে যেন ধমক দিল। অল্প হলেও এবার আমরা শব্দটা বেশ স্পষ্ট শুনতে পেলাম। মৃদুল চোখ বড় বড় আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'রতনের গলার শব্দ মনে হলো!'

সঙ্গে সঙ্গে আমি বললাম, 'হ্যাঁ, আমার কাছেও তা-ই মনে হলো।'

'রতন!' বিটলু অবাক হওয়ার মতো করে বলল, 'রতনের গলা! চল তো।'

বিটলু এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই মৃদুল ওর হাত টেনে ধরে বলল, 'কোথায় যাচ্ছিস?'

'ঘরের ভেতর।'

'ঘরের ভেতর যাওয়া কি ঠিক হবে আমাদের?'

'কেন ঠিক হবে না?'

মৃদুল আর কিছু বলল না, কী যেন ভেবে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'দীপ্র, তুই কী বলিস?'

'চল না, ঘরের ভেতরটা দেখেই আসি।'

আমরা চারজন কোনো রকম শব্দ না করে ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। তারপর একে অপরের দিকে তাকিয়ে একসঙ্গে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লাম ঝট করে। যা ভেবেছিলাম তা-ই—মেঝের ওপর চট পেতে ঝন্টু, বাদল, রতন আর টোটন বসে আছে, আর ওদের সামনে বসে আছে প্রায় বিশ-পঁচিশটা ছেলে-মেয়ে। প্রত্যেকের সামনে একটা করে শিশুশিক্ষা বই। ওদের দেখে মনে হচ্ছে ওরা এই বস্তিতেই থাকে এবং সবার বয়স আমাদের মতোই।

আমাদের দেখেই রতন, ঝন্টু, বাদল, টোটন একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল। অবাক হয়ে গেছে ওরা। এত রাতে যে আমরা এখানে আসতে পারি, ওরা তা ভাবতেই পারছে না। বিটলু একটু এগিয়ে গিয়ে খুব নরম গলায় বলল, 'রতন, তোরা এদের লেখাপড়া শেখাচ্ছিস?'

'হ্যাঁ।' রতন আস্তে করে উত্তর দেয়।

মৃদুল এগিয়ে এসে রতনের কাঁধে একটা হাত রেখে বলে, 'কবে থেকে লেখাপড়া শেখাচ্ছিস এদের?'

'কয়েক মাস হয়ে গেছে।'

'তাই নাকি!' অয়ন বলল।

'কেন ওদের লেখাপড়া শেখাচ্ছিস?' বিটলু বলল।

'কয়েক মাস আগে পেপারে একটা লেখা পড়েছিলাম আমরা। বস্তির ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া শিখছে এবং একটা স্কুলের কয়েকজন ছাত্র মিলে তা শেখাচ্ছে। লেখাটা পড়ে আমাদের এত ভালো লেগেছিল! আমরা ঠিক করলাম আমরাও তো ছাত্র, আমরাও এ রকম বস্তির ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখাব। তারপর আমরা খুঁজে খুঁজে এই বস্তিটা বের করি। বস্তির বড়দের সঙ্গে কথা বলতেই তাঁরা রাজি হয়ে গেলেন।' রতন খুব শান্তভাবে কথাগুলো বলল।

'কিন্তু এত রাতে কেন?' আমি বললাম।

'ওরা সারা দিন এখানে-ওখানে কাজ করে, রাতে বাসায় ফেরে। আমরাও তো দিনে স্কুল থেকে বের হতে পারি না। সবকিছু মিলিয়ে রাতে পড়ানো ছাড়া কোনো উপায় ছিল না।'

'এদের লেখাপড়া শেখাতে তোদের লেখাপড়ার কোনো ক্ষতি হচ্ছে না?'

আমি বললাম।

'না। কারণ আমরা সপ্তাহে মাত্র তিন রাত পড়াই।'

মেঝের মাঝখান থেকে একটা ছেলে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমাদের এ ঘরটাও ভাইয়ারা বানিয়ে দিয়েছেন।'

বিটলু রতনদের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বলল, 'তোরা এ ঘরটা বানিয়ে দিয়েছিস?'

'হ্যাঁ। প্রথম দিন পড়াতে এসে দেখি লেখাপড়া শেখানোর কোনো ঘর নেই ওদের। তারপর আমরা আমাদের টিফিনের টাকা বাঁচিয়ে, ঈদের সেলামির টাকা, বার্থ ডেতে পাওয়া টাকা জমিয়ে এই ছোট্ট ঘরটা তুলে দিয়েছি।' কথাগুলো বলতে বলতে রতনের চোখ দুটো চিকচিক করে ওঠে।

বিটলু অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে রতনের দিকে। কেবল বিটলু না, আমরাও তাকিয়ে আছি অবাক হয়ে। এ মুহূর্তে কেন যেন আমাদের খুব ছোট ছোট লাগছে। রতনদের আমরা কত ক্ষেপিয়েছি, বিরক্ত করেছি, ঝগড়া করেছি! আমরা ওদের কত খারাপ ভেবেছি! আর ওরা কিনা কত ভালো! চোখে পানি এসে যায় আমার। কিছুটা ঝাঁপিয়ে পড়ে রতনকে জড়িয়ে ধরি বলি, 'তোরা কি আমাদের বন্ধু হবি?'

রতন হাসতে হাসতে বলে, 'হব।'

বিটলু রতনের একটা হাত চেপে ধরে বলে, 'আমরাও কি তোদের সঙ্গে ওদের পড়াতে আসতে পারি?'

'অবশ্যই।'

'কবে থেকে আসব?'

রতন জবাব দেওয়ার আগেই দরজার কাছ থেকে কে যেন বলে, 'কাল থেকেই।'

ঝট করে আমরা দরজার দিকে তাকাই—অনতু দাঁড়িয়ে আছে! মিটিমিটি হাসতে হাসতে ও মুখটা গম্ভীর করে বলে, 'তোরা আমার সঙ্গে একটু আসবি?'

আমাদের সবাইকে পেছনে ফেলে রতন দ্রুত অনতুর সামনে দাঁড়িয়ে বলে, 'তোকে এমন দেখাচ্ছে কেন অনতু? কী হয়েছে তোর?'

'আমার কিছু হয়নি। রাস্তার ওপাশে সাদা রঙের একটা বাসা আছে, সম্ভবত ওই বাসাটায় ডাকাত পড়েছে।'

'বলিস কি!' রতন অনতুকে প্রায় খামচে ধরে বলে, 'তুই কী করে বুঝলি ডাকাত পড়েছে?'

'রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম আমি। হঠাৎ ওই বাসাটার কাছ দিয়ে আসতেই কয়েকবার ডাকাত ডাকাত বলে চিৎকার করতে শুনেছি। একটু পর দেখি বাসার সব আলো নিভে গেল একসঙ্গে। তারপর তোদের এখানে দৌড়ে এলাম।' অনতু কিছুটা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল।

'আমরা যে এখানে, তুই জানলি কী করে?'

'পরশু রাতে তোরা যখন স্কুলের দেয়াল টপকাচ্ছিলি, তখন তোদের ফলো করেছিলাম আমি। আজ যে বিটলুরা এসেছে, তাও দেখেছি।'

রতন মেঝেতে বসা ছেলে-মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমরা এখন যার যার বাসায় চলে যাও, তোমাদের আজ ছুটি।'

সাদা রঙের বাসাটার কাছে এসেই চমকে উঠলাম আমরা। চারপাশের সব বাসায়ই কিছু না কিছু আলো আছে, কেবল এ বাসায়ই কোনো আলো নেই। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

বাসাটার একটু ফাঁকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি সবাই। একটা সুযোগ খুঁজছি, বুদ্ধিও বের করার চেষ্টা করছি। রতন হঠাৎ আমাদের সবাইকে আরো একটু কাছে ডেকে গলাটা নিচু করে বলল, 'একটা বুদ্ধি এসেছে আমার মাথায়।'

অনতু রতনের দিকে মাথা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'কী বুদ্ধি?'

'আমরা তো ছোট মানুষ, আমাদের পক্ষে ডাকাত ধরা সম্ভব নয়। আর আমাদের আশপাশে কোনো থানাও নেই যে পুলিশ আঙ্কেলদের খবর দিতে পারব আমরা। আমি যে কাজটা করতে চাইছি সেটা হলো—আমরা এখানে মোট নয়জন আছি, এ নয়জন একটু দূরে থেকে বাসাটা ঘিরে ফেলব।' রতন সবাইকে বুঝিয়ে দিচ্ছে।

'তারপর?' অনতু এমনভাবে জিজ্ঞেস করে, যেন ওর আর দেরি সহ্য হচ্ছে না।

'সাদা বাসাটার পাশে একটা টিনের ঘর দেখা যাচ্ছে না?' রতন সবার দিকে তাকিয়ে বলে।

আমরা সবাই ওদিকে তাকিয়ে বলি, 'হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে।'

'রাস্তায় অনেক ইটের টুকরো আছে। আমাদের প্যান্টের সবগুলো পকেটে যতগুলো ইটের টুকরো ভরা যায় প্রথমে তা ভরে নেব আমরা। তারপর দু হাত বোঝাই করেও ভরে নেব।'

'আমাদের যাদের শার্টের পকেট আছে, সে পকেটে নেব না?' অয়ন

রতনকে জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ, শার্টের পকেট থাকলে সেখানেও নেব। তারপর আমরা বাসার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে সবাই একসঙ্গে ইটের টুকরা ছুড়তে থাকব ওই টিনের চালে আর চিৎকার করতে থাকব ডাকাত ডাকাত বলে।'

'এখানে একটা সমস্যা হতে পারে।' অনতু বলল।

'কী সমস্যা?'

'ডাকাত ডাকাত চিৎকার শুনে যদি ডাকাতগুলো বের হয়ে পালাতে চেষ্টা করে?'

'হ্যাঁ, সে চেষ্টা তারা করবে।'

'তাহলে?'

'কোনো ডাকাত দেখামাত্র আমরা টিনের চালে ঢিল মারা বাদ দিয়ে ওই ডাকাতকে ঢিল মারতে থাকব আর চিৎকার করতে থাকব। এরই মধ্যে আশপাশের অনেক মানুষ ছুটে আসবে এদিকে।'

'আশপাশের অনেকে যখন ছুটে আসবে তখন আমরা কী করব?'

'খুব ভালো কথা। তখন আমাদের পালাতে হবে। কারণ কেউ যদি জিজ্ঞেস করে এত রাতে তোমরা এখানে কেন, তোমরা কোথায় থাকো, ডাকাত পড়েছে এটাই বা জানলে কী করে তোমরা, তখন কিন্তু আমাদের অবস্থা ডাকাতদের মতোই হবে। আমরা রাত করে স্কুল থেকে বের হই এটা স্যাররা জেনে ফেলবেন, আর স্যাররা জেনে ফেললে কী হবে এটা তো আমরা সবাই জানি।' রতন বলল।

'ঠিক, আমাদের কোনোভাবেই কারো সামনে পড়া যাবে না। ডাকাত ডাকাত শুনে বেশ কয়েকজন এগিয়ে এলেই আমরা দ্রুত আমাদের স্কুলের দিকে চলে যাব।' অনতু বলল।

বাসার চারদিকে আমরা নয়জন দাঁড়িয়ে পড়েছি। আমাদের সবার পকেট, হাত ইটের টুকরোতে বোঝাই। অনতুর প্রথম টিনের চালে ঢিল ছোড়ার কথা। আমরা অনতুর ঢিল ছোড়ার অপেক্ষা করছি।

অনতুর দেরি হচ্ছে দেখে বিটলু শিস বাজাল। একটু পর অনতুর ঢিল এসে পড়ল টিনের চালে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই একসঙ্গে ঢিল ছুড়তে লাগলাম আর চিৎকার করতে লাগলাম ডাকাত ডাকাত বলে।

আমার বাঁ পাশে আছে বিটলু আর ডান পাশে রতন। বিটলু হঠাৎ চিৎকার

করে বলল, 'একটা ডাকাত বের হয়ে এসেছে।'

বাসার গেটের দিকে তাকিয়ে দেখি, কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকা একটা লোক সত্যি সত্যি বের হয়ে এসেছে। এপাশের আমরা তিনজন টিনের চালে ঢিল ছোড়া বাদ দিয়ে এবার ওই মুখঢাকা লোকটাকে লক্ষ্য করে ঢিল ছুড়তে শুরু করলাম। লোকটা আবার দ্রুত বাসার ভেতর ঢুকে গেল।

একটু পর আশপাশে তাকিয়ে দেখি প্রায় সব বাসায় আলো জ্বলে উঠেছে। এরই মধ্যে কেউ কেউ ডাকাত ডাকাত বলে এগিয়ে এসেছে। মাত্র পাঁচ মিনিট, প্রায় কয়েক শ মানুষ এসে ঘিরে ফেলল বাসাটা। একটা ডাকাতও আমরা বাসা থেকে বের হতে দিইনি।

রতন আমাকে ইশারা করল, আমি বিটলুকে ইশারা করলাম, বিটলু অনতুকে ইশারা করল—এভাবে সবাই ইশারা করার পর আমরা সাদা বাসাটা থেকে বেশ দূরে চলে এলাম। তারপর সবাই ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার বাসাটার দিকে তাকালাম। আনন্দে মনটা ভরে গেল আমাদের। যতগুলো মানুষ বাসাটা ঘিরে রেখেছে, তাতে ডাকাতরা তো দূরের কথা, স্পাইডারম্যান কিংবা সুপারম্যানও পালাতে পারবে না সেখান থেকে।

রুমের ভেতর শব্দ করে ঢুকে রতন কিছুটা চিৎকার করে বলল, 'এই দীপ্র, এখনো ঘুম থেকে উঠিসনি!'

ঝট করে বিছানায় উঠে বসলাম আমি। আমার বিছানার পাশে টোটন, ঝন্টু, বাদল আর রতন দাঁড়িয়ে। অবাক হয়ে ওদের দেখছি আমি। কারণ ওরা কখনো আমার রুমে আসেনি। বেশ কয়েক বছর ধরে আমরা একসঙ্গে পড়ছি, কিন্তু এই প্রথম ওরা আমার রুমে এলো।

রতন আমার পাশে বসে বলল, 'এত অবাক হওয়ার কিছু নেই, বন্ধুরাই তো বন্ধুর রুমে আসে, তাই না?'

ঝন্টুও আমার পাশে বসে বলে, 'জানিস, কালকের সবগুলো ডাকাত ধরা পড়েছে।'

'তাই নাকি! কে বলল তোদের?'

'আমাদের নাইটগার্ড আঙ্কেল। ডাকাত ধরা পড়ার কথা শুনে তিনি দেখতে গিয়েছিলেন। গিয়ে দেখেন সব ডাকাতের হাত-পা বেঁধে রাখা হয়েছে। '

'আর কিছু বলেছেন তিনি?' আমি বেশ আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করি।

'হ্যাঁ।' রতন একটু থেমে বলে, 'ওগুলো এখন থাক, পরে শুনব। তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নে, বাইরে নতুন স্যার দাঁড়িয়ে আছেন।'

'কেন!'

'তেমন কিছু জানি না, তবে জরুরি একটা ব্যাপার নাকি আছে।' রতন বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তুই বরং রেডি হয়ে বিটলুর হোস্টেলের দিকে আয়, আমি এর মধ্যে মৃদুলদের খবর দিয়ে আসি।'

'না না, তোরা বাইরে গিয়ে একটু দাঁড়া, আমি দু মিনিটের মধ্যে রেডি হয়ে আসছি।'

ঠিক দু মিনিটের মধ্যে বাইরে এসে দেখি নতুন স্যার বেশ গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। পাশে রতনরা দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখেই স্যার

বললেন, 'মৃদুল, বিটলু আর অয়নকে ডাকতে হবে, তোমাদের সঙ্গে জরুরি কিছু কথা আছে আমার। সময় বেশি নেই, ঘণ্টাখানেক পরই ক্লাস শুরু হবে। কথাগুলো বলেই তোমাদের নিয়ে অনতুর রুমে যেতে হবে আমাকে।'

বিটলু, মৃদুল আর অয়নকে ডেকে আনার পর আমাদের নিয়ে স্কুলের একপাশে এসে দাঁড়ালেন স্যার। তারপর কোনো রকম দেরি না করে বললেন, 'তোমরা অনতুর বিষয়ে কে কতটুকু জানো?'

রতন বলল, 'এক ক্লাসে পড়লেও অনতুর সঙ্গে আগে তেমন মেশা হয়নি আমাদের, ও মিশত বিটলুদের সঙ্গে। ওরাই বোধহয় ভালো বলতে পারবে অনতু সম্পর্কে।'

স্যার বিটলুর দিকে তাকালেন। বিটলু বলল, 'ওর বিষয়ে কী আর জানব? এক বন্ধু সম্পর্কে আরেক বন্ধু কতটুকুই বা জানে?'

'তা ঠিক।' স্যার সবার দিকে একবার করে তাকালেন, তারপর বললেন, 'অনতু সম্পর্কে তোমাদের আমি আজ যা বলব, তা কেবল তোমরাই জানবে, প্লিজ আর কাউকে বলবে না।' স্যার একটু থামলেন। মাথাটা নিচু করে কী যেন ভেবে আবার উঁচু করে বললেন, 'অনতু হচ্ছে একজন এতিম ছেলে। এতিম কাকে বলে তোমরা জানো তো?'

'যাদের বাবা নেই তাদের এতিম বলে।' আমি বললাম।

'হ্যাঁ। অনতুর বাবা-মা কেউই নেই। তোমরা হয়তো খেয়াল করেছ প্যারেন্টস ডেতে ও কিন্তু স্কুলের ভেতর ছিল না। সম্ভবত বাইরে কোথাও ছিল ও।' স্যার কথাটা শেষ করে মৃদুলের দিকে তাকালেন।

'জি স্যার, অনতুকে সেদিন আমরা অনেক খুঁজেও স্কুলের ভেতর পাইনি।' মৃদুল বলল।

'তোমাদের স্কুলে সাধারণত একটু সচ্ছল পরিবারের ছেলেরা লেখাপড়া করে, কিন্তু অনতু তো সচ্ছল না। তোমরা কি জানো ওকে এখানে কে এনে পড়াচ্ছেন?'

'কে?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'হেডস্যার।' মাথাটা নিচু করে নতুন স্যার বলেন, 'হেডস্যার কোনো একদিন একটা এতিমদের স্কুলে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে আসার সময় অনতুকে দেখে কেমন যেন মায়া অনুভব করেন তিনি। তারপর সেখান থেকে

এনে এই স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন তাকে। অনতুর লেখাপড়া, খাওয়া-দাওয়া, জামা-কাপড়, সব খরচ কিন্তু হেডস্যারই দেন।'

'তা ছাড়া হেডস্যার ওকে ভালোও বাসেন বেশি।' বিটলু বলল।

'খুবই স্বাভাবিক। কাল অনতুর সঙ্গে আমার একবার দেখা হয়েছিল। দেখলাম ওর মন খুব খারাপ। আমি ওকে অনেক কথা জিজ্ঞেস করলাম। কথা বলতে বলতে ও একবার বলেছিল, ও নাকি এ স্কুল থেকে পালাবে। শুনে আমার এত খারাপ লাগল! অনেক বুঝিয়েছি আমি। আসলে প্যারেন্টস ডেতে সবার বাবা-মা এসেছিলেন, কিন্তু ওর কাছে কেউ কখনো আসে না তো, ও খুব কষ্ট পায়।' স্যার কথা বলছেন, কিন্তু স্যারের চোখ ছলছল করছে।

'আমরা আসলে ওর এ ব্যাপারগুলো জানতাম না।' বিটলু কেমন দুঃখী দুঃখী গলায় বলে।

'আমিও জানতাম না। কাল আমি হেডস্যারের সঙ্গে ওর বিষয়ে কথা বলতে নিয়েই এত কথা জেনেছি। তোমরা ওকে একটু দেখে রাখবে, খুব দুঃখী একটা ছেলে। আর একটা কথা, তোমরা ওর বিষয়ে যে এত কিছু জানো, তা ভুলেও বুঝতে দিয়ো না ওকে। ও যদি ঝুঝতে পারে তোমরা ওর সবকিছু জানো, তাহলে ও হয়তো তোমাদের সঙ্গে কোনো দিন আর মিশবে না।' স্যার দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'চলো, এবার অনতুর রুমে যাই।'

স্যারকে নিয়ে অনতুর রুমে এলাম, অনতু নেই। এখানে-ওখানে খুঁজলাম, কোথাও নেই। স্যার কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, 'অনতু কোথায় যেতে পারে বলো তো?'

আমার হঠাৎ সেদিনের কথা মনে হলো। আমি বললাম, 'স্যার, সম্ভবত ও বাঁধের পাশে বটগাছটার কাছে আছে।'

স্যার কোনো কথা না বলে আমাদের নিয়ে দ্রুত বাঁধের পাশে চলে এলেন। যা বলেছিলাম তা-ই। বটগাছের নিচে চিকচিকে বালির ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছে অনতু। ওকে দেখে মনে হচ্ছে মুগ্ধ হয়ে আকাশ দেখছে ও। আমরা যে ওর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছি, ও তা একটুও টের পায়নি। স্যার আমাদের ইশারা করে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে কোনো রকম শব্দ না করে অনতুর মাথার পাশে গিয়ে বসে পড়লেন। তারপর অনতু কিছু টের পাওয়ার আগেই ওর মাথায় হাত রাখলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে অনতু উঠে বসল। স্যার ওর একটা

হাত ধরে আমাদের কাছে নিয়ে এলেন।

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে অনতু। স্যার ওর মাথায় একটা হাত রেখে বললেন, 'অনতু, তুমি কি আমাকে একটু এগিয়ে দেবে?'

অনতু মাথা তুলে অস্ফুট স্বরে বলল, 'কোথায়?'

'আমি আজ চলে যাচ্ছি।' স্যার হাসতে হাসতে বলেন, 'আমি আসলে তোমাদের টিচার হয়ে আসিনি। একটা স্কুলে একটা ট্রেনিং করার দরকার ছিল আমার, আমি সেই ট্রেনিং করতে এসেছিলাম। ট্রেনিং শেষ, এখন আমাকে চলে যেতে হবে। একটু পর আমার ট্রেন, তোমরা কি আমার সঙ্গে একটু আসবে?'

অনতু অবাক হয়ে বলে, 'স্যার, আপনি চলে যাবেন!'

'হ্যাঁ, আমাকে যেতে হবে।'

'আর কোনো দিন দেখা হবে না আপনার সঙ্গে?'

স্যার এবার কিছু বলেন না। মুচকি মুচকি হাসতে থাকেন তিনি। কিন্তু আমাদের সবার চোখ ভিজে গেছে।

স্যারের রুম থেকে ব্যাগটা নিয়ে রেলস্টেশনে এসেছি আমরা। সারা রাস্তা ব্যাগটা অনতুই বয়ে এনেছে, স্যারের সিটের কাছেও রেখে এসেছে অনতু।

রেলগাড়িতে উঠতে নিয়ে স্যার আবার ঘুরে দাঁড়ান। তারপর হাসতে হাসতে বলেন, 'আমার একটা ঘটনা বলি তোমাদের। তোমরা যদি কখনো রাতে রুম থেকে বের হতে তাহলে দেখতে আমি হাঁটছি। তোমরা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে কিন্তু আমি তোমাদের দিকে তাকাতাম না, তোমারা আমার পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে কিন্তু আমি তোমাদের সঙ্গে কোনো কথা বলতাম না। কারণ কী জানো? রাতে কোনো কোনো মানুষ ঘুমের মধ্যে হেঁটে বেড়ায়, এটা এক ধরনের রোগ। আমার এ রোগটা আছে। তোমরা আমাকে এভাবে হাঁটতে দেখলে বেশ মজা পেতে, তোমরা সে মজাটা মিস করেছ!'

স্যারের কথা শুনে অয়ন কী একটা বলতে নেয়, কিন্তু তার আগেই আমি ওকে চিমটি কেটে থামিয়ে দিই।

রেলগাড়ি ছেড়ে দেবে একটু পর। তার আগেই স্যার আমাদের সবার মাথায় একবার করে হাত বুলিয়ে বললেন, 'সম্ভবত আমি আবার আসব, তোমাদের জন্যই আসব।' স্যার অনতুর দিকে তাকান, তারপর ওর মাথার চুলগুলো হাত দিয়ে এলোমেলো করে দিয়ে বলেন, 'বিশেষ করে তোমার জন্য আসব।'

ছেড়ে দেয় রেলগাড়ি। আস্তে আস্তে চলতে চলতে সেটা জোরে চলতে থাকে। স্যার যতক্ষণ পারেন জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকেন আমাদের দিকে। আমরাও তাকিয়ে থাকি স্যারের দিকে। একসময় আড়াল হয়ে যায় রেলগাড়িটা, আমরা তবু তাকিয়ে থাকি!

---

ভালোবাসায় সিক্ত পথ হেঁটে যারা সামনে এগিয়ে যায়, তাদের কেউ কেউ পেছনটা ভুলে যায় অবলীলায়, কেউ কেউ ভোলে না কখনো। যারা ভোলে না, তাদের দলেই সুমন্ত, আমাদের সুমন্ত আসলাম।

দীর্ঘদেহী এই মানুষটা হেঁটে গেলে শব্দ হয় মাটিতে। কেউ কেউ একে বলে ঔদ্ধত্য। নিজের ছোট্ট জগৎ আর লেখালেখি নিয়েই দিনমান পড়ে থাকে সুমন্ত। কেউ কেউ একে অহংকার ভেবে ভুল করে। অথচ কী আশ্চর্য, এসব কিছুই ভাবায় না ওকে। ক্রোধ নয়, হিংসা নয়, শুধু একবুক অভিমান নিয়ে সুমন্ত পাড়ি দেয় বন্ধুর পথগুলো।

যারা সুমন্তকে কাছ থেকে দেখেছে তারাই জানে সুমন্ত তার লেখার মতই সরল। অন্যের দুঃখে যার চোখে পানি আসে; রিক্ত, নিঃস্ব আর বঞ্চিতদের নিয়ে দুর্গম সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার স্বপ্ন দেখে যে সুমন্ত; তার কি এত সহজ সরল হলে চলে? সব শুনে হাসে সুমন্ত। 'সরলতা দিয়েই একদিন জয় করব সবকিছু'— তার এই আত্মবিশ্বাসে একটুও চিড় ধরাতে পারি না আমরা, স্রষ্টার প্রতি অসীম নির্ভরতায় সে থাকে অবিচল।

পৃথিবীর যাবতীয় শুভবোধগুলো জাগিয়ে তোলার দায়ভার তার হাতে তুলে দিয়ে আমরা যারা নিশ্চিন্তে বসে আছি, তাদের অবাক করে দিয়ে প্রতিদিন একটু একটু করে এগিয়ে যায় সুমন্ত। কখনও কখনও আকাশ কালো করে মেঘ জমে, ঝড় ওঠে— নির্ভীক কান্ডারী সে, হাল ধরে রাখে শক্ত হাতে।

আমরা যারা ভুল করি, ভুল বুঝি তাকে— তারাও একসময় ফিরে আসি সুমন্তর কাছে, ফিরে যে আসতেই হয়। পরম মমতায় সে হাত রাখে আমাদের পিঠে। আমাদের সাথে নিয়েই হেঁটে যায় দীর্ঘ পথ। বন্ধু তো!

—কাছের বন্ধুরা

---

প্রচ্ছদ ▪ সব্যসাচী হাজরা